৮.১৭ শত্রুর কবলে নূর – Bangla Library

৮.১৭ শত্রুর কবলে নূর – Bangla Library

শত্রুর কবলে নূর –১৩৭

হঠাৎ গাড়ির সামনে কয়েকজন লোক পথ রোধ করে দাঁড়ালো। নূর গাড়ি থামিয়ে ফেলতেই গাড়ীখানাকে ঘিরে ফেললো ওরা। সবার মুখেই কালো কাপড় বাধা। কারো কারো মুখে মুখোস পরা ছিলো। হাতে রিভলভার।

নূর গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়ালো।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো–কি চাও তোমরা?

একজন এগিয়ে এলো, নূরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো সে-একটু পরই বুঝতে পারবে কি চাই আমরা। তার দক্ষিণ হস্তে রিভলভার ছিলো।

লোকটার কথা শেষ না হতেই নূর প্রচন্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিলো তার চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। হাতের রিভলভার ছিটকে, পড়লো। পরক্ষণেই অপর একজন আক্রমণ করলো নূরকে।

তাকেও লাথি মেরে ফেলে দিলো নূর।

ততক্ষণে আরও কয়েকজন এক সঙ্গে আক্রমণ করলো নূরকে।

পথটা নির্জন তাই তেমন কোন যানবাহন বা লোকজন এ পথে চলাচল করছিলো না। কাজেই দুস্কৃতিকারীগণ এই পথটা বেছে নিয়েছিলো নূরকে বাগে আনার জন্য। তারা গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছিলো নূর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। এই পথেই সে তার গাড়ি নিয়ে বাংলোয় ফিরবে। পথের পাশে লাইট পোষ্টগুলোর আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো ওরা। গাড়িখানা নিকটবর্তী হতেই ওরা বেরিয়ে এসেছিলো এবং গাড়ির সম্মুখে এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

এরা আরমানের দলের লোক।

আরমান প্রাচুর্যের লোভে বিদেশ থেকে মাদকদ্রব্য আমদানী করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছিলো। মাঝে মাঝে সে তার দু'একজন সহকারী নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতো এবং গোপনে নিয়ে আসতো নানা ধরনের মারাত্নক মাদকদ্রব্য আর হিরোইন। সমস্ত পৃথিবী আজ আচ্ছন্ন মাদকদ্রব্য সেবনকারী দ্বারা। দেশকে ধ্বংস লীলায় পরিণত করার আপ্রান চেষ্টায় উম্মাদ এরা, তাদেরই একজন আরমান। আরমান চেয়েছিলো নরকেও সে জড়িয়ে নেবে এই ব্যবসায়। নূরও আরমানের চক্রান্ত এবং মনোভাব বুঝতে পেরেছিলো আর সেই জন্য তার এ সংগ্রাম। বনহুর চায় দেশকে বাঁচাতে, দেশের পরম সম্পদ যুব সমাজ এরা যদি বিদেশী চক্রান্তের শিকার হয় তাহলে শুধু দেশই অধঃপতনে যাবে না। সমস্ত বিশ্ব হবে নিঃস্ব। মানুষ বলে কেউ থাকবে না এ পৃথিবীতে।

নূর এ কারণেই পিতার সহযোগীতায় বিশ্ব থেকে এই মাদক দ্রব্য উচ্ছেদ সংগ্রামে ব্রতি হয়েছে। হয়তো তার পক্ষে কতখানি সম্ভব হবে তা সে জানেনা তবে তার বিশ্বাস বনহুর যখন এ ব্যাপারে সাহায্য করছে তখন কৃতকার্য হওয়ার যথেষ্ট আশা আছে, আর সেই ভরসা নিয়েই নূর অগ্রসর হয়েছে। বনহুরের সঙ্গে সে অজানার পথে পাড়ি জমাবে, সেই কারণেই সে মায়ের কাছে গিয়েছিলো সাক্ষাৎ

করতে যদিও সে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেনি মাকে। নূর জানতো মা যদি সামান্য আভাস পায় তাহলে যে কোন উপায়ে তার যাওয়া বন্ধ করবে। তাই নূর এসব ব্যাপার চেপে কথা বার্তা বলেছে অতি সাবধানে।

গাড়িতে বসে এসব কথাই ভাবছিলো এবং গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ এমন একটা বিপদের সম্মুখীন হবে ভাবেনি নূর। এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠা নূরের পক্ষে একা সম্ভব হয় না। ওরা কমপক্ষে আট-দশ জন আর নূর একা।

তবুও বেশ কয়েকজনকে ঘায়েল করলো নূর।

কে একজন পিছন থেকে নূরের মাথায় ভীষণভাবে আঘাত করলো। নূর পড়ে গেলো ভূতলে। তারপর কিছু মনে নেই ওর।

যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো নূরের তখন সে দেখতে পেলো একটি জমাট অন্ধকার কক্ষে সে বন্দী। হাত পা শৃঙ্খলাবদ্ধ, একটুও নড়তে পারছে না সে। বড় পিপাসা বোধ করলো, সমস্ত জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অস্পষ্ট স্বরে বললো নূর পানি…পানি…।

কোন সাড়াশব্দ নেই।

নূরের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ফিরে এলো।

নূর পূনরায় চেষ্টা করলো, কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হয় কিনা। বললো সে পানি… আমাকে পানি দাও…

এবার মনে হলো কক্ষটির দরজার বাইরে পদ শব্দ হলো, ভারী জুতোর শব্দ। দরজা খুলে গেলো এবার।

নূর নিশ্চুপ পড়ে রইল, সে দেখতে চায় কে এরা এবং কি বলে, হয়তো তার কণ্ঠ শুনতে পেরেছে, সে যখন পানি পানি বলছিলো। কিন্তু একটু পরই নূর বুঝতে পারলো ওরা তার কণ্ঠ শুনতে পায়নি আর সে কারণেই উচ্চকণ্ঠে একজন বললো–এখনও বেটার জ্ঞান ফেরেনি।

অপরজন বললো–অনেক রক্ত পড়েছে, মাথার আঘাতটা ভয়ংকর লেগেছে।

নূর বুঝতে পারলো তার কক্ষে দুইজন লোক প্রবেশ করেছে। এরা কারা। তবে শত্রুপক্ষ তাতে কোন ভুল নেই। তবে কি এরা মাদকদ্রব্য পাচারকারী দলের লোক। যদিও নূরের মাথা টনটন করছিলো, জিহ্বা শুকিয়ে আরষ্ট হয়ে গেছে। তবুও সে নীরব রইল, নূর জানতে চায় কি বলে ওরা।

একজন বললো–সাহেব বলেছে জ্ঞান ফিরলেই নিয়ে যেতে শুধু পায়ের বাঁধন খুলে দিতে।

অপরজন বললো–যেভাবে ঘায়েল হয়েছে তাতে হাঁটতে পারবে তো?

প্রথম ব্যক্তি বললো–হাঁটতে না পারলে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

দ্বিতীয়জন বললো–সাহেব এখন কোথায়?

মাল গুদামে বসে হিসাব-নিকাশ করছেন। কাল রাতে যে মালগুলো বাংলাদেশের জন্য পাঠানো হয়েছে তারই হিসাব হচ্ছে। বললো প্রথমজন।

সেখানে আর কারা আছে? দ্বিতীয়জনের গলা।

ওর নাম ঠিক জানি না, তবে বড় মালিকের সঙ্গে প্রায়ই আসে সে এখানে। ছোঁকড়ার বয়স তেমন নয় তবে ভীষণ চালাক। আর সেই তো বড় মালিককে জানিয়েছিলো নূরুজ্জামান চৌধুরী ঐ পথে গাড়ি নিয়ে ফিরবে। তাকে আটকাতে পারলেই নাকি দস্যু বনহুরকে হাতের মুঠায় পাওয়া যাবে।

এবার বেশ বুঝতে পারছি বড় মালিকের এক নম্বর খদ্দের আরমান।

হাঁ তাই হবে।

ওরা নূরের সংজ্ঞা ফিরে আসেনি মনে করে বেড়িয়ে যাচ্ছিলো এমন সময় নূর বলে উঠে-পানি। আমাকে পানি দাও....

থমকে দাঁড়ালো ওরা, একজন বললো–উঠো পানি দিবো।

অন্যজন বললো–চলো তোমাকে পানি আর সরবত দেওয়া হবে।

নূরকে টেনে তুলে নিয়ে চললো ওরা দুজন।

সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা উপরে এনে লিফটে তুললো।

নূর বুঝতে পারলে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূগর্ভস্থ কোন স্থানে রাখা। হয়েছিলো। এবার তাকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সামান্য সময় লাগলো তার নুর সহ পৌঁছে গেলো এমন এক জায়গায়, সে স্থান একটি গুদাম ঘর ছাড়া কিছু নয়। চারিদিকে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং কাঠের আলমারী, প্রতিটি আলমারীতে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের প্যাকেট। কক্ষে কোন জানালা বা অপর কোন দরজা নেই।

গুদাম কক্ষটিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রন মেশিন চলছে।

কক্ষের মাঝামাঝি একটি টেবিল এবং টেবিলের চারপাশে বসে আছে কক্ষের ব্যক্তি। তাদের প্রত্যেকের মুখে মুখোস পরা, কাউকে চিনতে পারেনা নূর।

নূরের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাধা চুল এলোমেলো, রক্ত শুকিয়ে কপালে লেপটে আছে। শুধু সে বললো–পানি। আমাকে এক গেলাস পানি দাও…

একজন মুখোসধারী বললো–দাও ওকে পানি দাও।

যারা নূরকে এখানে নিয়ে এলো তারা একজন এক গেলাস মাদক দ্রব্য মেশানো পানি এনে দিলো। নূরের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় সে মুখ বাড়িয়ে দিলো। এক চুমুক পানি মুখে দিয়েই মুখটা নূর বিকৃত করে ফেললো, সে বুঝতে পারলো তাকে এমন কোন মাদকদ্রব্য মেশানো পানি পান করতে দেওয়া হয়েছে যা বিষের চেয়েও বিস্বাদ।

এবার চেয়ারে বসা একজন বলে উঠলো–কি হলো সুস্বাদু পানি পান না করে ফেলে দিলে যে?

নূরের কণ্ঠস্বর চিনতে বাকি রইল না, এটা তার পরিচিত বন্ধু আরমানের গলা। ঐ মুখোসের তলে আত্মগোপন করে নূরকে ধোকা দিবার চেষ্টা করছিলো সে। নূর ভীষণ অসুস্থবোধ করলেও সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আরমানের মুখোস ঢাকা চোখ দুটোর দিকে। কোন জবাব দিলনা নূর।

পুনরায় বললো আরমান–ক্ষুদে ডিটেকটিভ তুমি এবার হাড়ে হাড়ে বুঝবে কতখানি চালাকি চালছো।

অপর ব্যক্তিটি বললো–ওকে একটা ১নং পুশ করে দাও তাহলে নেশা ধরে যাবে। এই ভাবে সাতদিন ধরে চলবে পুশ করা তার পর দেখবে ও যত বড় ডিটেকটিভ হোক। বশীভূত হয়ে গেছে।

বললো আরমান–আমরা ওকে ইচ্ছা করলে হত্যা করে মৃত্যুগহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারি, কিন্তু তা করবোনা। ওকে আটকে রেখে আমরা বনহুরকে আটক করতে চাই। নূরকে আমরা শিকার পাকরাও করার টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চাই।

অন্যজন বললো–মিঃ আরমান আপনার পরামর্শ ঠিক। ওকে আমরা বড় শিকার ধরার টোপ হিসাবেই ব্যবহার করবো। আমাদের ব্যবসার প্রথম কন্টক হলো বনহুর। হীরাঝিলের অভ্যন্তরে আমাদের কয়েক কোটি টাকার মালামাল ছিলো তা ধ্বংস করেছে ঐ বনহুর।

এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো টেবিলের মধ্য আসনে বসা এক জন মুখোশধারী। এবার সে কথা বললো–আমি বিমান ধ্বংসে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম প্রখ্যাত হিরোইন ব্যবসায়ী মিঃ রবার্ট এর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু সব জেনে ফেলেছে বনহুর। এবার বনহুরকে খতম অথবা আটক করতে না পারলে আমাদের ব্যবসা কিছুতেই চালানো সম্ভব হবে না।

আর একজন বললো–ওকে সরিয়ে দাও কারণ ওর অবস্থা শোচনীয় হলেও জ্ঞানে পাকা আছে।

বললো আরমান–বন্ধু আমাকে হয়তো চিনতে পেরেছে, তাতে আমার দুঃখের অথবা ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ তুমি এখন আমাদের হাতের মুঠায়। এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করা আমাদের উচিৎ হলেও করবো না কারণ বনহুরকে পাকড়াও করতে হলে তোমাকে জীবিত রাখা দরকার। তাছাড়া তুমি যে উদ্দেশ্য নিয়েই দাওনা কেন আমার ব্যবসার পাটনার হিসাবে তুমি কোটি কোটি টাকা আমাকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আমি তোমার কাছে ঋণিও বটে। একটু থেমে বললো আরমান–যাও ওকে নিয়ে যাও এরপর আমি নিজে দেখা করবো। তবে হাঁ ওকে ঠান্ডা পানি পান করতে দিও।

যে দু'জন লোক নূরকে ধরে নিয়ে এসেছিলো তারাই পুনরায় ফেরৎ নিয়ে চলে গেলো নূরকে।

এবার সেই কক্ষ নয় অন্য একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হলো নূরকে। ঠান্ডা পানিও পান করতে দেওয়া হলো।

কিন্তু তার হাত দু'খানা তেমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ রইলো। নূর কক্ষের দেয়ালে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলো আরমান একদিন তার পরম বন্ধু ছিলো, একসঙ্গে গল্প করতো, বেড়াতে এমনকি একই শয্যায় শুয়ে ঘুমাতো। বিদেশ গিয়েও সেই ভাবে পড়াশোনা করছিলো। দু'জনা ছিলো দু'জনার জীবন সাথী আর আজ সেই আরমান অর্থের লোভে জানোয়ারের চেয়েও ভয়ংকর হয়েছে। তাকে একদিন আরমান সিগারেট বোম দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো, সেদিন যদি সে সিগারেটটা পাল্টে না নিতো তা হলে মৃত্যু তার অবধারিত ছিলো। কেউ বুঝতেই পারতো না কিভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে তবে পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে সবাই জানতে পারতো সব কিছু। হঠাৎ একটা শব্দ হলো, নূর আরো অন্ধকারে তাকালো দরজার দিকে। দরজা খুলে গেলো। কে একজন প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

আরমান তাকালো কোন কথা সে বললো না।

লোকটা এবার সোজা সুজি এসে দাঁড়ালো তার সামনে, বললো–বন্ধু আর কত মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করবে। এবার হাত মিলাও আমার হাতের সঙ্গে কিন্তু কোন চালাকি চলবেনা। তুমি কোটি কোটি টাকা আমার ব্যবসায় দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছ, কিন্তু এই টাকা দেওয়ার পিছনে যে তোমার মতলব ছিলো তা ধরা পড়ে গেছে আমার কাছে। নূর তুমি চাও আমার ব্যবসার গোপন রহস্য জানতে কিন্তু মনে রেখো তুমি সব কিছু জানলেও আমার ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। এখন তুমি যেখানে বন্দী এটাই আমাদের গোপন ঘাঁটি। এখানে যাদের সঙ্গে তুমি আমাকে দেখলে তারা সবাই আমার এই ব্যবসার পার্টনার এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিও বটে। তোমাকে বন্ধু জেনেই কথাগুলি বলছি, নিজের ভুল বুঝতে পেরেও যদি আমার ব্যবসায় সহায়তা করো তাহলে শুধু জীবনেই বাঁচবে তা নয়। অগাধ টাকার মালিক হবে।

নূর এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনেই যাচ্ছিলো এবার বললো সে-টাকার মোহ বা লোভ আমার নাই এ কথা তুমি পূর্ব হতেই জানো। তাহলে তুমি এতো টাকা, আমাকে ব্যবসার জন্য কেনো দিয়েছিলে?

তুমিই-তো বললে তোমাদের ব্যবসার গোপন রহস্য উদঘাটনের জন্য আমি।

সেই উদ্দেশ্য সফল হবেনা নূর। আর সে কথাও আমি একটু পূর্বে বলেছি। তবুও তোমাকে ভাববার সময় দিলাম বন্ধু! অহেতুক আমাদের ব্যবসার পিছনে লাগার কোন কারণ ভেবে পাই না। জানো আজ গোটা পৃথিবীময় এই হিরোইন উজ্জল আলোক রশ্মির মত ছড়িয়ে পড়েছে।

হাঁ তা জানি, সে আলোক রশ্মি সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিতে চলেছে তাও জানি।

নূর তুমি পারবে এই আলোর বন্যাকে প্রতিরোধ করতে? বিশ্বের যুব সমাজ আজ এই আলোর বন্যায় গা ভাসিয়ে চলেছে।

এই আলোর বন্যাই বলো আর আলোক রশ্মিই বলো তা স্তব্ধ করে দিতে হবে। নির্মূল করতে হবে এই আলোক রশ্মির মূল স্তম্ভটির ভিত। যেন আর আলোর বন্যা ছড়িয়ে না পড়ে।

পারবে তুমি নির্মূল করতে এই মহাশক্তিকে?

আমি না পারলেও আমার মত শত শত মানুষ তারা তো পারবে। হয়তো তুমিও একদিন যোগ দেবে তাদের সঙ্গে, অবশ্য তোমার মোহ না কাটালে তুমি পারবে না। এ জন্য বেশ সময়ের দরকার আছে। আরমান সামান্য অর্থ আর ঐশ্বর্যের মোহে তুমি বিশ্বের যুব সমাজকে পঙ্গু করে দিতে চাও? আরমান তুমি এক বার গভীর ভাবে ভেবে দেখো লোভ-লালসার মোহে তুমি কোন কাজে পা বাড়িয়েছে।

তোমার মত নির্বোধ নই আমি নূর। যা পূর্বে বলেছি সময় রইল ভেবে দেখ। নইলে কোন দিন এখান থেকে বেরুতে পারবে না। হাঁ আর একটা কথা শুনে রাখো, মিঃ রবার্ট মেরিন মৃত্যুর অভিনয় করে লোক চক্ষুর অন্তরালে সরে থেকে তার ব্যবসা চালিয়ে যাবে কিন্তু আমি জানি তারই ছদ্মবেশে তারই এক সহকারী জীবন নাশ করেছে আর সে দিব্যি আরামে এই কান্দাই নগরে আত্মগোপন করে নিজের প্রসার জমানোর কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তা হতে পারেনা, আমি তাকে যাক এর বেশি জেনে লাভ নেই তোমার।

আমিও শোনার আগ্রহী নই, তুমি যেতে পারো–বললো নূর।

আরমান ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে যেমন ভাবে এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো।

দরজা বন্ধ হতেই জমাট অন্ধকারে ভরে উঠলো কক্ষটা।

নূর আবার হেলান দিলো দেয়ালে।

*

মনিরা কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে দিলো। যখন সে শুনলো নুর বাসায় ফেরেনি। তার গাড়িখানা পাওয়া গেছে কোন এক পথের ধারে। নাওয়া-খাওয়া নেই, পুলিশ সুপার মিঃ আজমেরী রুশদীর কাছে বার বার ফোন করে নুরের সংবাদ জানার চেষ্টা করেছে মনিরা কিন্তু কোন ফল হয়না। কান্দাই পুলিশ মহল শহরের নানা স্থানে তল্লাশী চালিয়েও নূরের কোন সন্ধান পায়নি। তাই তারাও মনিরাকে তেমন কোন সংবাদ জানাতে সক্ষম হচ্ছেন না।

এমন সময় স্বামী যদি পাশে থাকতো তাহলে তার সহযোগীতা পেতে মনিরা বা তার সংগে পরামর্শ করতে পারতো কিন্তু বেশ কিছুদিন হলো বনহুরের খেজও পায়নি সে। চাকর-বাকর দিয়ে আর কতদূর খোঁজ-খবর করানো যায়। তবুও বেচারী হোসেন আর মকবুল ছুটোছুটি করে ফিরছে। ওদেরও স্বস্তি নেই এক মুহূর্ত।

যে জায়গায় গাড়িখানা পাওয়া গেছে সেখানে পুলিশ মহলের গোয়েন্দা বিভাগ সতর্কতার সংগে নজর রেখেছে। মিঃ নূরের অন্তর্ধান গোটা কান্দাই শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

পুলিশ সুপার মিঃ রুশদী নতুন এসেছেন কান্দাই শহরে। তার পূর্বে ছিলেন মিঃ আহম্মদ। তিনি বদলী হয়ে চলে যাবার পর মিঃ রুশদীর আগমন। কান্দাই আসার পূর্বে এই কান্দাই শহর নিয়ে তার কানে অনেক কথাই গেছে। সবচেয়ে তাকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিলো বনহুরের কাহিনী। দস্যু বনহুর, কান্দাই শহরই শুধু নয় গোটা পৃথিবীর একটি বিস্ময় সে। তার কথা যতই শুনেছিলেন মিঃ রুশদী ততই অবাক হয়েছেন, দস্য হলেও সে নাকি এক মহান হৃদয় মানুষ। যেমন তার চেহারা, তেমনি কার্যকলাপ। অপরূপ পৌরুষদীপ্ত চেহারা, তেমনি মহৎ। ধনবান অসৎ ব্যক্তিদের কাছে সে যতদূর আর অসহায় মানুষগুলোর কাছে বনহুর দেবতা। এসবই পূর্ব হতেই শুনেছিলেন মিঃ রুশদী। তাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, মিঃ রুশদী আরও শুনেছিলেন কান্দাই কোন এক পুলিশ সুপার কন্যা বনহুরকে ভালও বেসেছিলো এবং বনহুরের জন্য পিতার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটিও হয়েছিলো। পিতা যখন

তাকে গ্রেফতার করার জন্য মোটা অংক অর্থ ঘোষণা করেছিলেন কন্যা তখন তাকে কাছে পেয়েও সবার অজ্ঞাতে সরিয়ে দিয়েছে। এই দস্যু বনহুর শুধু পুলিশ সুপার কন্যার হৃদয়ের রেখাপাত করেনি। বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির তরুণী কন্যাগণ ভালবেসেছে তাকে কিন্তু এই বনহুর এক অদ্ভুত মানুষ। কোন তরুণী বা রমণীর প্রতি সে অসৎ ব্যবহার করেনি বা তাদের দেহ স্পর্শ করেনি কোনদিন। নারীর মর্যাদা ছিলো তার কাছে আর সেই কারণেই বনহুর নারী জাতাঁকে সম্মানিত দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে। না জানি এই ব্যক্তি কেমন কে জানে। মিঃ রুশদী কান্দাই আসার পর থেকে প্রায়ই বনহুরকে নিয়ে ভাবতেন কিন্তু কোনই সমাধান খুঁজে পেতেন না। যদিও বনহুর আইনের চোখে অপরাধী তবুও তার চোখে বনহুর সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা ছিলো। অবশ্য কান্দাই আসার পর সেই ধারণা তাকে আরও আকৃষ্ট করে তুলেছে।

হঠাৎ মিঃ নূরুজ্জামান চৌধুরীর নিখোঁজ ব্যাপারটা রুশদীর মনে আলোড়ন জাগিয়েছিলো। ঘটনাটা বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিলো। মিসেস মনিরার সঙ্গে দেখা করে মিঃ রুশদী জানতে পেরেছিলেন সেই দিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে কাটানোর পর মিঃ নূরুজ্জামান তার বাংলোয় ফিরছিলো, তারপর থেকে সে নিখোঁজ। তবে সে গেলো কোথায়। কিছুদিন হলো নূরুজ্জামান মাদকদ্রব্য ব্যাপার নিয়ে বেশ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সে প্রায়ই মিঃ রুশদী এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার রফিকুল আলমের সঙ্গে কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনা চালায়। অবশ্য মাদকদ্রব্য ব্যাপার নিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের যুব সমাজকে পঙ্গু করে দেবার জন্য কোন কোন রাষ্ট্র উঠে পড়ে লেগেছে এ কথা সব মহলের মানুষই জানে তবুও স্বার্থান্বেষী মহল ব্যবসায় মুনাফা লুটার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তারা ব্যবসায় প্রচুর অর্থ লুটছে। অনেকেই রাতারাতি ধনকুবের বনেও যাচ্ছে। নূর পুলিশ মহলের সহযোগীতা কামনা করেছিলো...

হঠাৎ মিঃ রুশদীর চিন্তা জাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। টেবিলে ফোনটা স্বশব্দে বেজে উঠে।

মিঃ রুশদী হাতের অর্ধ দগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে রেখে রিসিভারটা তুলে নেয় হাতে...হ্যালো স্পিকিং পুলিশ সুপার রুশদী...

ওদিক থেকে শোনা যায় অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর...আমি আপনাকেই চাই...

কে আপনি?..বললেন মিঃ রুশদী।

ওপাশ থেকে শোনা গেল...মিঃ নূরুজ্জামানের সন্ধান আমি পেয়েছি... আপনাদের সাহায্য দরকার হবে...

আপনি কে? কি করে নূরুজ্জামানের সন্ধান পেলেন?

সব পরে বলবো। প্রথমে নূরুজ্জামানকে উদ্ধার তার সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে হবে দুস্কৃতিকারীগণকে তারা শুধু নূরুজ্জামানকেই অপহরণ করে নাই, তারা হিরোইন ব্যবসায়ী এবং পাচারকারী...

কোথা থেকে আপনি কথা বলছেন? কে আপনি?...বললেন মিঃ রুশদী।

আমি কে এবং কোথা থেকে বলছি জানতে চাইবেন না। বলুন আপনি আমার কথায় রাজি আছেন মিঃ রুশদী?...

আছি। কিন্তু আপনার পরিচয় না জানা পর্যন্ত...বিশ্বাস করতে পারছেন না এই তো?

হাঁ কতকটা তাই...বললেন মিঃ রুশদী।

তাহলে আপনি অপেক্ষা করুন আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই আসছি আপনার অফিসে...

...বেশ তাই হবে আমি অপেক্ষা করছি। বলে রিসিভার রাখলেন মিঃ রুশদী।

কিছুক্ষণ পর কান্দাই সেনা নায়ক মেজর ফিরোজ তার গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর রায়হান আলী এসে মিঃ রুশদীকে জানালেন স্যার মেজর ফিরোজ সাহেব এসেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানালেন।

মিঃ রুশদীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। তিনি নিজের হাতের হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন। সেই অজানা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার পর এখনও অর্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয় নাই। তিনি বিলম্ব না করে বেরিয়ে এলেন অফিসের বাইরে। সেলুট দিয়ে বললেন মিঃ রুশদী স্যার আপনি! হঠাৎ এ ভাবে...

কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন মিঃ ফিরোজ কিছুক্ষণ পূর্বে আমিই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম।

স্যার আমি, আমি ঠিক চিনতে পারিনি আপনার গলা।

যাক লজ্জিত হবার কিছু নেই। চলুন ভিতরে কথা আছে আপনার সঙ্গে।

চলুন স্যার। মিঃ রুশদী মেজর ফিরোজ সহ অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন। উভয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিভৃতে আলাপ করার পর বেরিয়ে এলেন।

মেজর ফিরোজ বিদায় গ্রহণের পর মিঃ রুশদী কান্দাই ওসিকে নির্দেশ দিলেন, পুলিশ ফোর্স নিয়ে তৈরি থাকতে। একটি হিরোইন ব্যবসায়ী ঘাঁটিতে হানা দিতে হবে।

মিঃ রুশদী নিজেও তৈরি হয়ে নিলেন।

*

গভীর রাত।

নুরকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি লৌহ চেয়ারে বসানো হয়েছে। তার পাশেই ইলেকট্রিক লাইন, পাশে একটি বৈদ্যুতিক তার ঝুলছে। তাকে এবার ইলেকট্রিক শর্ট দেওয়া হবে। কারণ নূর কিছুতেই আরমানের বশ্যতা স্বীকার করেনি। ইলেকট্রিক শট দিয়ে পঙ্গু বানানো হবে।

নূরের উপর ইতিপূর্বে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার শরীরে তার চিহ্ন বিদ্যমান। মাথার চুলগুলো ললাটে ছড়িয়ে আছে, চুল বেয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেহের জামা কাপড় ছিন্ন ভিন্ন, কিছু কিছু অংশ দেহের নজরে পড়ছে। সেই অংশগুলোতে ক্ষত চিহ্ন বিদ্যমান।

সম্মুখে দন্ডায়মান আরমান ও তার কয়েকজন সঙ্গী।

এরা আজ নূরের কাছে তার শেষ মতামত চেয়ে বিফল হয়েছে। আরমান ও তার সঙ্গীগণ মনে করেছিলো এই কদিনের মধ্যে বনহুর আসবে নূরের উদ্ধারে। তারা জানতো বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই আর সেই চিন্তাধারা নিয়েও তারা

নূরকে এমন এক জায়গায় আটক করে রেখেছে যেখানে প্রবেশ করলে কিছুতেই বনহুর আর বেরিয়ে যেতে পারবেনা। যেমন করে সুকৌশলী শিকারীগণ তাদের শিকার ধরবার খাঁচা তৈরি করে ঠিক সেইভাবে নূরকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে এই গোপন বন্দীখানাকে খাঁচার মত তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশের পথ সহজ কিন্তু বের হবার কোন পথ ছিলোনা।

আরমান তার সুদক্ষ সঙ্গীদের সহযোগীতায় এমন এক বন্দীশালা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলো যার মধ্যে প্রবেশ করলে আর বের হওয়া যাবে না। তারই একটি গোপন কক্ষে নূরকে আজ ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে শট দেবার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিলো।

আর মাত্র সামান্য কয়েক মিনিট সময় তারপরই শুরু হবে কাজ। আজ আরমানের মুখে মুখোস নাই, চোখ দুটি হিংস্র শার্দুলের মত ধক ধক্ করছে। বললো। আরমান-আজ তোমার মৃত্যু অনিবার্য। বন্ধু বলে এ কদিন তোমাকে জীবিত রেখে তোমাকে আমার পথে আনার জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বলেছি কিন্তু তুমি অত্যন্ত ধূর্তের মত আমাকে...ঠকাতে চেয়েছে। এখনও সময় আছে মাত্র কয়েক মিনিট, যদি চুক্তি পত্রে সহি করো তাহলে জীবনে বাঁচতে পারো। নইলে এই দেখো ইলেকট্রিক সুইচ এটা টিপলেই তোমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়বে।

আরমান মত্য যন্ত্রণাকে আমি ভয় করি না, আমাকে তুমি যে ভাবে পারো হত্যা করো কিন্তু মনে রেখো তুমি তোমার কাজে সফলতা লাভ করতে পারবেনা কোনদিন।

তা হলে তুমি এই ভয়ংকর মৃত্যুকে সানন্দে গ্রহণ করতে চাও? দাঁতে দাঁত পিষে বললো আরমান।

হাঁ। দৃঢ় কণ্ঠস্বর নূরের।

আরমান তার একজন সহকারীকে ইংগিত করলো, ঝুলন্ত তারটি চেয়ারে সংযুক্ত করে সুইচ অন করতে।

সহকারী আরমানের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো। এবার সে ঝুলন্ত ইলেকট্রিক তারটি চেয়ারে সংযোগ করলো।

সুইচ অন করে দেবার পূর্বেই একটি গুলি এসে বিদ্ধ হলো সহকারীর বুকে। সুইচ অন করা আর হলো না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো বৈদ্যুতিক চেয়ারটির পাশে।

আরমান ও তার সঙ্গীগণ ভীষণভাবে চমকে ফিরে তাকালো। তারা অবাক হলো-তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিশ এবং তাদের পুরোভাগে দু'জন-তারা হলেন পুলিশ সুপার মিঃ রুশদী আর মেজর ফিরোজ।

মেজর ফিরোজের পিস্তলের গুলিই আরমানের সহকারীর বক্ষ ভেদ করেছে তাতে কোন ভুল নাই। কারণ তার পিস্তলের মুখ থেকে তখন ধূম্র নির্গত হচ্ছিলো। আর মুহূর্ত বিলম্ব হলে লোকটা সুইচ অন করে দিতে, সঙ্গে সঙ্গে নূরের দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করতো।

মিঃ রুশদী বললেন স্যার-আমরা ঠিক সময় মত পৌঁছতে পেরেছি। নইলে মিঃ নুরুজ্জামানকে জীবিত পাওয়া যেতো না।

আরমান ও তার সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে গেছে। তাদের এই গোপন ঘাঁটির সন্ধান সহজে কেউ আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না কারণ এই ঘাঁটিটি ছিলো গভীর মাটির তলায় উপরে যানবাহন চলাচলের পথ। পথের অনতিদূরে একটি মন্দির আর সেই মন্দিরের তলদেশ দিয়েই এই ভূগর্ভের ঘাটিতে প্রবেশ মুখ।

এই মন্দিরের পুরোহিত বেশী ব্যক্তি ধনঞ্জয় বর্মা একজন নর শয়তান। সে আরমানের একজন পার্টনার। পুরোহিত বেশে সে বহু লোকের সর্বনাশ সাধন করে চলেছে। এই মন্দিরে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের শুভাগমন হয়ে থাকে। ধনঞ্জয় বর্মা শুধু পুরোহিতই নয় সে একজন জ্যোতিষী বটে। তবে জ্যোতিষী বিদ্যা বলে তার বি বা ছিলোনা কোনদিন। ধর্মপ্রাণ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সহধর্মিনীগণ ভীড় জমাতো এই ভন্ড জ্যোতিষীর কাছে। সেই সুযোগ নিয়ে ধনঞ্জয় লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতো। শুধু তাই নয় এই সব নারীদের মধ্যে যাদের বয়স কম অথবা এদের তরুণী কন্যাদের লুটে নিতো ইজ্জৎ। হরণ করতে তাদের শিশু পুত্রদের।

এ সব কু-কর্ম করতে অত্যন্ত সুকৌশলে! মন্দিরের বাইরে কিছু গাড়ি অপেক্ষা করতো যে সব গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করতো ধনঞ্জয়ের লোক। তারা নজর রাখতে কোন মহিলার সঙ্গে শিশু সন্তান আছে। তাদের সম্মুখে এসে জানাতে আসুন আমাদের গাড়িতে। সুকৌশলে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যেতো তারপর

আর তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যেতোনা। পত্র পত্রিকায় অনেক লেখালেখি করেও কোন উপকার হতো না। এমনি করে বহু মাতা ও শিশুর জীবন প্রদীপ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতো এই মন্দিরের গোপন অভ্যন্তরে।

পুলিশ সুপার মিঃ হাসানাত এবং ইন্সপেক্টর আহসান আলী উভয়ে আত্নগোপন করে সন্ধান চালিয়ে চলেছিলো দীর্ঘ সময় ধরে। এই নারী ও শিশুগুলি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। নানাভাবে সন্ধান চালিয়েও তারা কোনই হদিস পাচ্ছিলেন না। মাঝে মাঝে পুলিশ সুপার মিঃ রুশদীর সঙ্গে আলোচনা হতো তাদের, এ ছাড়াও আরও কয়েকজন অবসর প্রাপ্ত পুলিশ গোয়েন্দা তাদের সহায়তা করছিলেন।

একদিন সীতানাথ বাবু এসে হাজির হলেন পুলিশ অফিসে। পুলিশ মহলের কাছ থেকে যে সীতানাথ বাবু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন এখন সেই ব্যক্তির আত্নগোপন করার কোন প্রয়োজন হয় না, তিনি সচ্ছন্দে পুলিশ মহলে যাতায়াত করেন বিনা দ্বিধায়।

নূর তার পথ পরিস্কার করে দিয়েছে।

সীতানাথ বাবু রাজা ধর্মেন্দ্র বর্মনকে কেন প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছিলেন এবং কি কারণে রামানন্দ লাল নাম ধারণ করে আত্মগোপন করেছিলেন সব কিছুই উন্মোচন করেছিলো আদালতে। এ ব্যাপারে সহায়তা করেছিলো নূর স্বয়ং।

নির্দোষ কন্যাকে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্যই সীতানাথ বাবু উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন সেদিন তিনি। আর সেই কারণেই প্রকাশ্য দিবালোকে অগণিত লোকের সম্মুখে এই জঘন্য কাজ তিনি করেছিলেন। শুধু কন্যা হত্যাই নয় রাজা ধর্মেন্দ্র বর্মন একজন স্মাগলার ছিলেন এবং তিনি হিরোইন ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন এটাও তার জঘন্য অপরাধ ছিলো।

আদালতে সব কিছু প্রমাণিত হওয়ায় সীতানাথ বাবু বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন-তারপর তিনি সুকৌশলে হিরোইন ব্যবসায়ী স্মাগলারদের সন্ধান করে ফিরতেন। যে নূর তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলো সেই নূর অপহরণ সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ সীতানাথ স্থির থাকতে পারেননি। তিনি গোপনে অনুসন্ধান করে ফিরছিলেন। নিশ্চয়ই নূরের পিছনে হিরোইন ব্যবসায়ী স্মাগলারদের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।

গোপনে তিনি পুলিশ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই নূরের অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন। প্রায়ই শহরে নারী এবং শিশু অপহরণ লেগেই রয়েছে। বহু চেষ্টা করেও কান্দাই পুলিশ মহল এর কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বৃদ্ধ সীতানাথ একদিন সন্ন্যাসীর বেশে শহরের শেষ প্রান্তে বহু কালের জরাজীর্ণ এই মন্দিরটিতে গিয়ে হাজির হয় এবং মন্দিরের পুরোহিত ধনঞ্জয় বর্মার শিষ্য হবার অনুনয় করে।

ধনঞ্জয় বর্মা সানন্দে তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে।

প্রায় আশি বছরের বৃদ্ধ কোন গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করতে পারে এমন ধারণা সে করতে পারেনি বরং মনে করেছিলো তার মন্দিরে এমন কিছু ব্যক্তির অবস্থান ভক্ত মহলের সুদৃষ্টি ও বিশ্বাস স্থাপনে সহায়তা করবে।

সুদীর্ঘ কয়েকমাস ধরে সীতানাথ বাবু এই মন্দিরে অবস্থান করে ধনঞ্জয় বর্মার ভিতরের রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হন। দিনের বেলায় বেশ কিছু নারী ও শিশু সমাবেশ হয় এ মন্দিরে। তারা কেউ নিজস্ব গাড়িতে অথবা ভাড়াটিয়া গাড়িতে এসে থাকেন। তাদের সঙ্গে পুরুষ মানুষ তেমন থাকেন না কারণ মা কালীকাঁদেবীর স্বপ্নদেশ আছে এ মন্দিরে নারী ও শিশু ছাড়া পুরুষের প্রবেশ বা আগমন নিষিদ্ধ। ধর্মভীরু মহিলাগণ তাই স্বামীর অগোচরে এই মন্দিরে আসেন। এ মন্দিরে যে আশা নিয়ে আসবে তাই পূর্ণ হবে এটাই ছিলো নারীমহলের অন্ধবিশ্বাস।

কোন মহিলা আসতেন স্বামী সোহাগিনী হবার অভিপ্রায় নিয়ে। কেউ আসতেন সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনায়, কোন মহিলা আসতেন স্বামীর ব্যবসার উন্নতি কামনা করে। নিঃসন্তান মহিলাগণ আসতেন সন্তান লাভের আশা বুকে নিয়ে। সঙ্গে আনতে তারা নানা উপঢৌকন, টাকা-পয়সা, ফলমুল, মিষ্টান্ন। তারা সবাই যে ফিরে যেতো তা নয়। দু'চার দিন আসার পর নিখোঁজ হতো, আর কেউ তাদের সন্ধান পেতো না। যেহেতু প্রায়ই মহিলাগণ স্বামীদের অগোচরে আসতো তাই স্বামীগণও জানতোনা কোথায় গেলো স্ত্রী-পুত্র অথবা স্ত্রী-কন্যা।

সীতানাথ বাবু বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর বেশে তাকে মানাতো ভাল। সমস্ত শরীরে ছাই ভস্ম মেখে রুদ্রাক্ষোর মালা জপতেন আর বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করতেন। লক্ষ্য ছিলো সাধক ধনঞ্জয়ের কার্যকলাপ।

মাঝে মাঝে দামী গাড়ি আসতো, তাতে সন্দেহের কিছু থাকতোনা। তবে সেই গাড়িতে আসতো দামী নামী কিছু ব্যক্তি। যারা মন্দিরে প্রবেশ করে কোন গোপন পথে অন্তধাম হতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটতো তাদের মন্দিরের অন্তরালে।

সীতানাথ বাবু সুকৌশলে এই মন্দিরের অন্তরালে প্রবেশের গোপন সিঁড়ি পথের সন্ধান পান। আরও জানতে পারেন এই মন্দিরের পিছনে আরও একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। যে সমস্ত নারী ও শিশু মন্দিরে কালিকাঁদেবীর পূজো দিতে এসে আর ফিরে যায়নি-তাদের অপহরণ করে সেই বিস্ময়কর গোপন সুড়ঙ্গ পথে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শিশুদের হত্যা করা হয়। আর মায়েদের উপর চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন। কেড়ে নেওয়া হয় তাদের দেহের স্বর্ণালঙ্কার। এই গোপন পথে যাদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদের বেরিয়ে আসার কোন আর পথ থাকেনা। এ পথ অতি দুর্গম, কঠিন। সীতানাথ বাবু সব কিছু সগ্রহ করে নিয়ে জানান পুলিশ সুপার মিঃ হাসানাতকে, এমন কি নূরকে সেই মন্দিরের তলদেশে বন্দী করে রাখা হয়েছে এটাও তিনিই জানান।

সীতানাথ বাবুর সহায়তায় পুলিশ মহল সব জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে তারা। নূরকে যখন বৈদ্যুতিক তাদের সাহায্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ রুশদী ও মেজর ফিরোজ সেই দুর্গম পথে প্রবেশ করে এবং দেখতে পায় এ মুহূর্তে নূরকে পরপারে পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে নরপশুরা। তাই এক সেকেন্ড বিলম্ব না করে মেজর ফিরোজ তার উদ্যত রিভলভার থেকে গুলি নিক্ষেপ করোছলো হত্যাকারার বুক লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আর্তনাদ করে ভূতলে পড়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে আরমান ও তার সহকারীগণ। ফিরে তাকাতেই মুখমন্ডল তাদের ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তবে তা ক্ষণিকের জন্য, তারপর বিস্ময়ভরা দৃঢ় কণ্ঠে বললো আরমান–কে আপনাদের এই স্থানে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তাকে আমরা ক্ষমা করবো না...

হাঃ হাঃ করে মেজর ফিরোজ হেসে উঠলেন। তারপর দাতে দাঁত পিষে বললেন-ঘঁদুরের গর্তে সাপ প্রবেশ করলে ইঁদুর আর রক্ষা পায়না। তুমি ইঁদুরের চেয়েও অসহায়-ইংগিত করেন মেজর ফিরোজ ওদের হাতে হাত কড়া পড়িয়ে দিতে।

মেজর ফিরোজ ইংগিত করবার পূর্বেই মিঃ রুশদী এবং পুলিশ সুপার হাসনাত ও তাদের সঙ্গী পুলিশ প্রধানগণ ঘিরে ফেলেছিলেন আরমান ও তাদের সঙ্গী সাথীদের।

সীতানাথ বাবুর দেহে তখনও সন্ন্যাসী বাবার পোশাক, তিনি এগিয়ে এলেন এবং বললেন-আর বিলম্ব করবেন না। এদের বন্দী করে তারপর অসহায় নারী আর শিশুদের উদ্ধার কাজ সমাধা করুন।

মিঃ হাসনাত বললেন–হাঁ স্যার আর বিলম্ব নয়।

পুলিশ বাহিনী ততক্ষণে ওদের হাতে হাত কড়া পরাচ্ছিল।

আরমানের দৃষ্টি সীতানাথ বাবুর উপর পড়তেই ভীষণ আশ্চর্য হলো। এতক্ষণ তিনি পুরোহিত ধনঞ্জয় বর্মাকে আটক করার ব্যাপারে নীরব। একটু পরই বুঝতে পারলো সে পুরোহিতবেশী ধনঞ্জয় বর্মা একজন ডিটেকটিভ। তিনি পুরোহিতের বেশ ধারণ করে সমস্ত রহস্য উদঘাটন করে পুলিশ মহলকে জ্ঞাত করেছেন। এই পুরোহিত বেশি ধনঞ্জয় হলেন প্রখ্যাত গোয়েন্দা আহাদ

সকল দুস্কৃতিকারীগণের হাতে হাত কড়া পরলো এবং বন্দী হলো আরমান সহ হিরোইন ব্যবসায়ীমহল সবাই।

*

নূর আর বনহুর এসে দাঁড়ালো নতুন যানটির পাশে। বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড যানটি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এ যানটি তারই সৃষ্টি, এ যানটি চালক হিসাবে বনহুর ও নূরকে ভাল ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন মার্শাল লর্ড। এ যানটি অদ্ভুত ধরনের। আকাশ পথে চলাকালে কোন শব্দ হয় না বা কোন আলো বিচ্ছুরিত হয় না। বনহুর আর নূর বিস্ময়কর যানটিতে উঠে বসে বেল্টে নিজ নিজ দেহ বেধে নিচ্ছিলো।

মিঃ মার্শাল লর্ড কোটের পকেট থেকে একটি ম্যাপ বা মানচিত্র বের করে বনহুরের হাতে দিয়ে বললেন-এটা তোমাদের পথের নির্দেশ দিবে। কোন অসুবিধা হবেনা তোমাদের।

বনহুর ভাঁজ করা কাগজখানা বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ডের হাত থেকে নিয়ে যানটির ভিতরে একটা হাতলে রাখলো। তারপর হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

সুইচ টিপতেই যানটি ভেসে উঠলো শূন্যে।

হাতলে মিটার চলতে শুরু করেছে।

অপর একটি সুইচে চাপ দিতেই মুহূর্তে যানটি আকাশ পথে উল্কা বেগে ধাবমান হলো। সামান্য কয়েক সেকেন্ড মাত্র, এত, দ্রুত যানটি অদৃশ্য হলো বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন-তার মুখমন্ডল প্রসন্ন, ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস।

যানটি ইথোল মাংলতে পৌঁছতে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় লাগলো। বনহুর নিজেও ইথোলতে আসেনি কোনদিন, মিটার এবং দিকদর্শণ যন্ত্রটি কাজ করছে। এতে বেগে এই বিস্ময়কর যানটি ধাবিত হচ্ছিলো সে নিচের কোন বস্তু তাদের নজরে আসছিলো না। ড্রাইভ আসনের সামনে টেলিভিশন পর্দার মত ছিলো তাতেই দেখা যাচ্ছিলো যখন যে শহর বন্দর বা সাগর অতিক্রম করছিলো তারই ছবি। নদী-নালা, বন-জঙ্গল সবই এতো দ্রুত অতিক্রম করছিলো যে সব প্রায় একাকার লাগছিলো মাঝে মাঝে।

নূর ম্যাপ ধরে বসেছিলো, এখন তাদের বাহনটি এসে গেছে ইথোলর কাছাকাছি। নির্জন কোন স্থানে অবতরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানচিত্রে। নূর আংগুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলো বনহুরকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুরের যানটি পৃথিবীর কাছাকাছি নেমে এলো। একটি পর্বতের কাছে সমতল ভূমি দেখে অবতরণ করলো বনহুর আর তাদের সেই বিস্ময়কর যানটি।

যান থেকে প্রথমেই অবতরণ না করে সুইচ টিপলো টেলিভিশন ক্যামেরার। ইথোল মাংলোর প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট ভেসে উঠলো টেলিভিশন পর্দায়। চক্রাকারে বোতামটা ঘোরাতে শুরু করলো নূর। বললো সে-বাপু, আমাকে মিঃ মার্শাল লর্ড বলেছেন পাঁচ থেকে সাতবার এটা ঘোরালেই তোমাদের নজরে পড়বে যেখানে হিরোইন প্রস্তুত হয় সেই ঘাটি।

হাঁ ঠিকই বলেছো নূর। বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। হঠাৎ দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো, বললো–নূর তুমি ভাল করে তাকিয়ে দেখো আমরা ঐ স্থানে যে একটি সুউচ্চ অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছি ওটাই হলো সেই হিরোইন তৈরির ঘাটি। বৈজ্ঞানিক মিঃ লর্ড যেভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই ভাবেই আমরা অতি সহজে ইথোল মাংলোতে পৌঁছে গেছি! যানটি এখানে থাকবে। চলো তোমাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। তবে কিছুদিন সময় লাগবে, অতি কঠিন কাজ। আমি চাই সমূলে ধ্বংস করতে ইথোলর হিরোইন প্রস্তুতকারী ঘাঁটি।

বনহুর আর নূর যানটি রেখে নেমে পড়লো।

বললো বনহুর যানটি রইল সন্ধ্যায় ফিরে আসবো এখানে। ফিরবার পূর্বে দরকার মেরীর সন্ধান করা। তাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কাজে অগ্রসর হতে পারবো না।

বনহুর আর নুর ইথোল শহরে পৌঁছতেই বেশ সময় লেগে গেলো। বনহুর নূরকে বললে নূর তুমি শ্রমিকের ড্রেস পড়ে নাও। আর আমি বৃদ্ধ পিতা তোমার। একেবারে আমি তোমাকে নিয়ে হাজির হবো হিরোইন তৈরির ঘাঁটিতে। সেখানে তোমার চাকুরীর জন্য অনুরোধ জানাবো।

বাপু যদি তোমার কৌশল ঠিক না হয়। ওরা যদি.....

চাকুরী না দেয় এই তো?

হাঁ।

সে ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না নূর।

বনহুর আর নূর যখন সেই সুউচ্চ অট্টালিকার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো তখন তাদের দেখলে বোঝার ভুল হবে না এরা শ্রমিক নয়। মলিন ছেঁড়া জামা প্যান্ট, মাথায় পুরোন টুপি। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ।

ওদের দেখে একজন বিদেশী সাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলোতোমরা কি চাও?

বললো ছদ্মবেশী বনহুর–চাকুরী চাই! আমরা বড় গরিব দূর থেকে এসেছি।

হাসলো সাহেব, বললো তার সহকারী লোকটিকে নিয়ে এসো ওদের।

বনহুর আর নূরের চাকুরী হয়ে গেলো।

এতো সহজে ওরা চাকুরী পাবে ভাবতেও পারেনি এবং তাদের আকাঙ্খিত জায়গায় চাকুরীটা।

বনহুর আর নূর শুধু বাইরে কাজ পেলো, ঘাটির ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। তারা শুধু মালামাল গাড়িতে উঠাবে এবং গুছিয়ে রাখবে। কোটি কোটি ডলারের মালামাল বিভিন্ন দেশে পাচার হচ্ছে।

বনহুর আর নূরকে ঘাটির ভিতরে প্রবেশ করতে না দেওয়া হলেও তারা উপায় খুঁজতে লাগলো।

মাল উঠানো কাজে ব্যস্ত বটে কিন্তু সেগুলো যাতে ইথোলের বাইরে না যায় তার জন্য বনহুর ও নূর সজাগ। তাদের কাছে রয়েছে রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। বিমান যখন মালামাল নিয়ে আকাশে উডডয়ন করবে তখন বনহুর তার রিমোট কনট্রোল দ্বারা বিমানটিকে ধ্বংস করে দেবে।

ইথোল বিমান বন্দরে একটি মালবাহী বিমান ক'দিন ধরে অপেক্ষা করছে। ইথোলের বিমান বাহিনীর অধিনায়কের অনুমতিক্রমে বিমানটিকে বিমান বন্দরে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই বিমানে বোঝাই করা হচ্ছে ইথোলের তৈরি শিশু খাদ্য। এইসব শিশু খাদ্যের প্যাকেটের অভ্যন্তরে রয়েছে হিরোইন পাউডার ও ইনজেকশন।

ইথোল বিমান ঘাঁটির মহাপরিচালক মিঃ মারকার মাসার সঙ্গে মিঃ রবার্ড এর যোগাযোগ ছিলো। হিরোইন প্রস্তুতকারক ঘাটির অভ্যন্তরে ছিলো একটি সুড়ঙ্গ পথ। ঐ পথে মিঃ মারকার মাসা গভীর রাতে ঘাটিতে যাওয়া আসা করতো। বিমান ঘাঁটির কেউ জানতো না ব্যাপারটা। মিঃ রবার্ট ও ইথোল বিমান বন্দরের কোন এক গোপন কক্ষে মিলিত হতো এবং হিরোইন ও মাদক দ্রব্য বিদেশে চালান, দেওয়া ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতো।

হিরোইন প্রস্তুত কেন্দ্রটি শিশু খাদ্য প্রস্তুত কেন্দ্র হিসাবে ইথোলবাসীর কাছে পরিচিত ছিলো। সকলে জানে এখানে প্রস্তুত হয় লক্ষ লক্ষ টাকার শিশু খাদ্য এবং এ সকল বিমান যোগে চালান যায় দেশ বিদেশে।

এখানে বেশ কিছু বিদেশী শ্রমিক দিবা-রাত্রি কাজ করে পয়সা উপার্জন করে। যারা ভূগর্ভে হিরোইন তৈরীর কাজ করে তারা বিশ্বস্ত এবং হিরোইন তৈরীর ব্যাপারে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ মেকানিক বিভিন্ন জ্ঞান ভান্ডার ওরা। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে তারা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

এরা ভূগর্ভ ছাড়া বাইরে বের হয় খুব কম। মিঃ রবার্ট ও মারকার মাসা তাদের উপরে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কিছু প্রহরী দিবা রাত্র প্রহরায় রত থাকে।

বেশ কয়েক দিন ধরে প্যাকেটগুলি রাত্রির অন্ধকারে বিমান বন্দরে চালান করা হচ্ছে। একটি নির্ধারিত দিনে বিমানটি ইথোল বিমান বন্দর ত্যাগ করবে।

মিঃ রবার্ট গিয়েছে কান্দাই শহরে, সেখান থেকে এখনও ফিরে আসেনি সে। ওয়ারলেসে যোগাযোগ করেও কান্দাই থেকে তার কোন সংবাদ পায়নি মিঃ মারকার মাসা। তাই ভীষণ একটা চিন্তায় আছে মিঃ মাসা।

বিমানে মালামাল প্রায় বোঝাই শেষ হয়ে এসেছে। বিমানটি ইথোল ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাইলট মিঃ মাসার নির্দেশের অপেক্ষা করছে। মিঃ মাসা বার বার কান্দাই বিমান বন্দরে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করেও মিঃ রবার্টের কোন খোঁজ পাচ্ছে না।

হিরোইন তৈরীর প্রধান অধিনায়ক মিঃ রবার্ট কান্দাই গিয়েছিলো ব্যবসার ব্যাপারে। কিন্তু তার কোন নির্দেশ না পাওয়ায় শিশু খাদ্য বহনকারী বিমান ইথোল বিমান বন্দর ত্যাগ করার নির্দেশ পাচ্ছে না।

পাইলট মাংতুচিং চীন দেশের লোক, ভাল ইংরেজী জানে সে। ক্রু তিনজন আমেরিকান।

এখানে যখন মালবাহী বিমান মালামাল নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন আরমানসহ তার সহকারীগণ এবং প্রখ্যাত হিরোইন প্রস্তুত কারক মিঃ রবার্ড কান্দাই পুলিশ বাহিনীর হাতে বন্দী। তারা কান্দাই জেলে আটক।

হিরোইন ব্যবসায়ী মহলই শুধু বন্দী হয়নি, তাদের ঘাটি গুলিও পুলিশ মহলের হেফাযতে চলে এসেছে। সমস্ত সামামাল সিজ করে নেওয়া হয়েছে। বিচারে

তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে এবং অচিরেই বিচার কার্য সমাধা করা হবে তাতে কোন সন্দেহ। নাই।

এই কয়দিনে বনহুর ইথোলের শিশুখাদ্য প্রস্তুতকারী গোপন আস্তানার অনেক কিছুই জেনে নিয়েছে। এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিক মিঃ মার্শাল লর্ডের কন্যা মিস মেরীর সন্ধানও সংগ্রহ করেছে বনহুর এবং নূর। যদিও তারা শ্রমিকের বেশে কাজ করছে তবুও গোপনে সব কিছুর খোঁজ সংগ্রহ করেছে।

মেরী বন্দী মিঃ রবার্টের কোন এক গোপন গুহায়! তাকে বন্দী করে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ডকে হাতের মুঠায় আনা। যদিও সে জানে বা জানতে বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড স্বইচ্ছায় দেশ ত্যাগ করেনি। তাকে কৌশলে কে বা কারা অপহরণ করে নিয়ে গেছে কোন উদ্দেশ্য সাধনে। বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড ছিলো দেশের সম্পদ। তাকে হাত করতে পারলে অনেক উদ্দেশ্যই সফল হবে বা হতো এ কথা জানতো মিঃ রবার্ট আর সেই কারণেই তার কাছে গোপনে প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছিলো সে। প্রথমে বৈজ্ঞানিক জানতে চেয়েছিলো কি কাজে তাকে সহায়তা করতে হবে।

তারপর যখন মিঃ রবার্ট বলেছিলো তার উদ্দেশ্যের কথা তখন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড আহত চাতকীর মত চমকে উঠেছিলো। শিশু খাদ্যের মাধ্যমে তারা হিরোইন ও বিভিন্ন মাদক দ্রব্য দেশ-বিদেশে চালান দিবে। তারই জন্য একটি এমন কৌশল অবলম্বন করে দিতে হবে যেন কারো কাছে তাদের এই কৌশল ফাঁস না হয়। কোটি কোটি ডলার তাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো তাতেও যখন মার্শাল লর্ডকে মিঃ রবার্ট হাত করতে পারেনি তখন তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিলো।

জানতে পারে বনহুর কারণ বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড-এর সঙ্গে একবার পরিচয় ঘটেছিলো সিন্ধে। গারোকং এর ভূগর্ভ গুহায় একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরি কালে মার্শাল লর্ড সিন্ধের নিচে মাটি চাপা পড়ে। তখন বনহুরের এক অনুচর সংবাদটা দেয় বনহুরকে।

মার্শাল লর্ডের নাম বনহুর শুনেছিলো এবং জানতো বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড, তার ক্ষমতা অসাধারণ, এমন একটা ব্যক্তির প্রয়োজন সবারই রয়েছে। সংবাদটা শুনবামাত্র বনহুর সিন্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলো এবং সুকৌশলে ভূগর্ভ থেকে মিঃ লর্ডকে উদ্ধার করেছিলো। বনহুর মিঃ লর্ডকে উদ্ধার

করার পর যখন তার পরিচয় পেয়েছিলো তখন খুশীই হয়েছিলো মিঃ লর্ড। কারণ বনহুর সম্বন্ধে জানতে মিঃ লর্ড, প্রখ্যাত দস্যু বনহুর শুধু কান্দাই দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বিচরণ বিশ্বব্যাপী। বনহুরকে বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করেছিলো মিঃ লর্ড।

বনহুর তাকে তার আস্তানায় নিয়ে এসে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলো, তার সুখ সুবিধা এবং যা সে ভালবাসে তাই বনহুর তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলো।

বৈজ্ঞানিক মিঃ লর্ড বলেছিলো–যারা তাকে অপহরণ করেছিলো তারাঅতি জঘন্য চরিত্রের মানুষ। যেমন করে যোক তাকে পুনরায় তারা অপহরণের চেষ্টা করবে। তার মেয়ে মেরীকে অপহরণ করে কোন অজানা স্থানে রেখেছে যার সন্ধান মিঃ লর্ড পায়নি। তার আবিষ্কৃত যান্ত্রিক মেশিনেও ধরা পড়েনি কোথায় মেরীকে তারা রেখেছে।

বনহুর বৈজ্ঞানিক মিঃ লর্ডের চোখে পানি দেখেছিলো, কন্যার কথা বলতে গিয়ে বার বার তার কণ্ঠ বাম্প রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। মিঃ লর্ড কন্যা মেরীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো বনহুর। আশ্বাস দিয়েছিলো সে যেমন করে হোক আপনার কন্যা মেরীকে খুঁজে বের করবোই।

বৈজ্ঞানিক মিঃ লর্ডের চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠেছিলো সেদিন। মিঃ লর্ড জানতো বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। তাকে সিন্ধের গারোকং এর শত শত ফুট মাটির তলদেশ থেকে সুকৌশলে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলো বনহুর। গারোকং জানতো বৈজ্ঞানিক মিঃ লর্ড ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই তাই করেনি তারা। মেরীর প্রয়োজন তাই তাদের কাছে ফুরিয়ে গিয়েছিলো। তবে তারা জানতো তার বাবা বৈজ্ঞানিক মিঃ লর্ডের কিছু নিতান্ত দরকারী বই পত্র এবং কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মিস মেরীর কাছে রক্ষিত রয়েছে। ঐগুলি তাদের একান্ত দরকার আর এ জন্যই মেরীকে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মিঃ লর্ড সিন্ধের গারোকং এর নিচে গভীর সুড়ঙ্গ তলে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে এটাই তাদের ধারণা। মেরীকেও এ সংবাদ জানানো হয়েছিলো। মেরী সংবাদটা শোনার পর ভীষণ কেঁদে ছিলো তারপর একদিন তার চোখের পানি শুকিয়ে গিয়েছিলো আপনা-আপনি। ভাবছিলো শত্রু পক্ষের চক্রান্তেই তার বাবার মৃত্যু ঘটেছে এবং এই ষড়যন্ত্রের শিকার এখন সে নিজে। পিতার কাগজ পত্র এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যবান যন্ত্রাদি মেরী গোপন একস্থানে সরিয়ে ফেলেছিলো সাবধানে। মেরী

বুঝতে পারে এই শয়তানদের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে তাকে কিছুটা চালাকীর সঙ্গে চলতে হবে। তাই মেরী মিঃ রবার্ট এর দলে যোগ দেয়।

বনহুর আর নূর ছদ্মবেশে যখন হিরোইন প্রস্তুতকারী কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করে তখন আর কেউ না চিনলেও মেরীর সন্দেহ হয় নতুন লোক দু'জন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে। তখন থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছিলো মেরী অবশ্য বনহুর এবং নূরও মেরীকে আন্দাজ করে নিয়েছিলো এই তরুণবেশী ব্যক্তি নারী ও সেই বৈজ্ঞানিক মিঃ মার্শাল লর্ড এর একমাত্র আদরের কন্যা। বনহুর আর নূর শ্রমিকের কাজ করলেও মেরীর উপর তাদের লক্ষ্য ছিলো।

একদিন বনহুর নুরকে বললো–আমরা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেছি হয়তো আমাদের কাজ এবার সহজ হবে। বিমান বন্দরে যে বিমানে মাল বোঝাই হলো সেটা এবার বিমান বন্দর ত্যাগ করবে।

মিঃ রবার্ট এর অনুমতি ছাড়া বিমানটি বিমান বন্দর ত্যাগ করবে না বলে জানলাম–বললো নূর।

বনহুর বললো–মিঃ রবার্ট সুচতুর কম নয়। সে কান্দাই থেকে পালিয়ে এসেছে। এবং সে গোপনে তার কাজ করে যাচ্ছে। আজই রাত্রি দুই ঘটিকায় আমাদের সেই নির্ধারিত বিমানটি ইথোল বিমান বন্দর ত্যাগ করবে। এই বিমানে আছে পাঁচ কোটি টাকার হিরোইন।এই হিরোইন দেশের বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ যুবদলকে পংগু করে দেবার জন্যই সুদান সরকার ইথোল মাংল প্রখ্যাত হিরোইন প্রস্তুতকারক মিঃ রবার্ডকে চুক্তিবদ্ধ করেছে। ইথোল এবং সুদান সরকার চায় না যুবসমাজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক। দেশকে ধ্বংস করার জন্য তাদের এই চেষ্টা। হাত ঘড়িটা পকেটে ছিলো ওটা বের করে দেখে নিলো বনহুর তারপর বললো–আমাদের যানে পৌঁছতে হবে এবং যেখান থেকেই আমরা এই হিরোইন বহনকারী বিমানটিকে রিমোট কন্ট্রোল–এর সাহায্যে ধ্বংস করবো। হাঁ তারপরই আমাদের উপর হিরোইন প্রস্তুতকারী অধিনায়কদের দৃষ্টি পড়বে। তারা আমাদের ছদ্মবেশ উম্মোচন করার জন্য আত্মনিয়োগ করবে। কাজেই বিমানটি ধ্বংস করার পরপরই আমরা হিরোইন প্রস্তুতকারী কারখানাটি ধ্বংস করবো। তার পূর্বে মেরীকে সরিয়ে নিতে হবে।

বনহুরের কথাগুলো নূর মনোযোগ সহকারে শুনছিলো। তার চোখের সামনে ভাসছিলো মেরীর সুন্দর মুখখানা। মাথায় রাশিকৃত সোনালী চুল, দুটি চোখে

মায়াময় চাহনী, সরু দুটি ঠোঁট, বিদেশিনী হলেও মিষ্টি চেহারা.......

বনহুর বললো–আমি কৌশলে হিরোইন প্রস্তুতকারক কারখানার অভ্যন্তরে ডিনামাইট বসিয়ে দিয়েছি, মেরীকে সরিয়ে দিতে পারলেই রিমোর্ট কন্ট্রোল ছারা ধ্বংস করে দেবো।

আব্বু তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। এবার আমাদের কাজ শুরু হোক। আমাদের যানে বসেই আমরা ইথোল মাংল বিমান বন্দর লক্ষ্য করতে সক্ষম হবো।

বনহুর বললো–হাঁ কাজ গুছিয়ে এনেছি নুর-আর বিলম্ব হবে না। চলো যানে গিয়ে তোমাকে সব বুঝিয়ে দিবো। তারপর আমি যাবো বিমান ঘাঁটির অদূরে, যেখান থেকে আমি কাজ করতে পারবো। নূর তুমি ভুল করবে না, কাজ সফল না হলে ইথোলয় আসা আমাদের বিফল হবে।

বনহুর আর নূর তাদের বিস্ময়কর যানে এসে বসলো, সম্মুখে ইথোল মাংলুর লুনা পর্বত। বনহুর সুইচ টিপলো-সঙ্গে সঙ্গে সামনের পর্দায় ভেসে উঠলো ইথোল বিমান বন্দর। প্লেন উঠানামা করছে, যাত্রীবাহী বোইং আকাশে চক্রাকারে ঘুরছে, বোইং প্লেনটির নিচে লাল আলো জ্বলছে। প্লেনটি প্রায় দু'শত যাত্রী নিয়ে ইথোল বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছে। বিমান বন্দরের অদূরে অপেক্ষা করছে হিরোইন বোঝাই বিমানটি। যাত্রী বোঝাই বিমানটি অবতরণের পর ফল পরিবহন নামক হিরোইন বোঝাই বিমানটি আকাশে উড্ডয়ন করবে। বনহুর চোখে বাইনোকুলার পরে নিয়ে প্রস্তুত হলো।

যান থেকে নামবার পূর্বে আরও একবার নূরকে সব বুঝিয়ে দিলো বনহুর। এবার বনহুর লুনা পর্বতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। এখান থেকে ইথোল বিমান বন্দর স্পষ্ট দেখা যাবে।

নূর হাত নাড়লো।

বনহুর চলে গেলো তার দৃষ্টির আড়ালে।

যাত্রীবাহী বোইং বিমানটি ইথোল বিমান বন্দরে অবতরণ করেছে। যাত্রীগণ বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে।

ওদিকে হিরোইন বোঝাই মালবাহী বিমান আকাশে উড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাইলট তার সামনে বসে বিমানের যান্ত্রীক অংশগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলো।

বনহুর সুকৌশলে পর্বত লুনার এক অংশে এসে পৌঁছে গেছে। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছে। যেখান থেকে ইথোল বিমান বন্দর স্পষ্ট দেখা যাবে সেখানে এসে দাঁড়ালো বনহুর। সবই সে দেখতে পাচ্ছে এখন।

যাত্রীবাহী বিমান ধীরে ধীরে রানওয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

যাত্রীগণ সবাই সরে এসেছে বিশ্রামাগারে, তাদের মালামাল গুলো চেকিং হচ্ছে। যান্ত্রিক মেশিনের ভিতর দিয়ে নেমে যাচ্ছে চেকিং পোষ্টে।

নূর যানে বসে দেখছে সব কিছু যানের টেলিভিশন ক্যামেরায়। মাঝে মাঝে লাল আলো জ্বলছে। তখন দেখাচ্ছে তার পিতা দস্যু বনহুর কি করছে তখন। কিভাবে সে রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে লুনা পর্বতের গা বেয়ে অগ্রসর হচ্ছে। পিতার অসাধ্য সাধনে নূরের চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠছে। টেলিভিশন ক্যামেরার পাশে একটির পর একটি বোতাম টিপছে নূর।

যাত্রীবাহী বোইং বিমান রানওয়ে ত্যাগ করে আকাশে ভেসে উঠেছে। এবার বনহুরের সেই মালবাহী বিমান রানওয়ে দিয়ে এগুচ্ছে। মালবাহী বিমানটির খোলে রয়েছে কোটি কোটি টাকার হিরোইন এবং কিছু শিশু খাদ্যের বাক্স। তার সঙ্গে আছে কিছু ফলমূলের বাক্স, যার আড়ালে গোপন করে রাখা হয়েছে হিরোইনের প্যাকেটগুলো।

মালবাহী বিমানটির পাইলট তার আসনে বসে চোখের চশমায় দেখে নিচ্ছে সম্মুখ রানওয়ে, যে পথে সে অগ্রসর হচ্ছে। এবার বিমানটি যখন আকাশে উড্ডয়ন করার জন্য বৃহাদাকার দেহটার খোলে চাকা দুটো গুটিয়ে নিলো তখন বনহুর তার রিমোট কন্ট্রোল বাগিয়ে ধরেছে।

ওদিকে রানওয়ের অদূরে দ্বিতল অফিস কক্ষের গোপন গবাক্ষে যান্ত্রীক মেশিন দ্বারা বিমানটিকে সংকেত দিচ্ছে ইখোল বিমান ঘাটির মহাপরিচালক মিঃ মারকার মাসা, তার পাশে রয়েছে প্রখ্যাত হিরোইন প্রস্তুতকারক মিঃ রবার্ড। নূরের বিস্ময়কর যানের ক্যামেরায় এদের কার্যকলাপও ধরা পড়ছিলো। নূর এই সংবাদ বনহুরের কানে আটকানো ওয়ারলেসে পৌঁছে দিচ্ছিলো।

মালবাহী বিমানটি আকাশে উঠে গেছে।

বিমান বন্দর ত্যাগ করার পরপরই বনহুর রিমোর্ট কন্ট্রোল এর সুইচ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি টাকার হিরোইন সহ প্রচন্ডভাবে বিস্ফোরিত হলো বিমানটি। বিমানটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভুতলে পড়লো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো হিরোইনসহ ছড়িয়ে পড়া বাক্সগুলোর।

মিঃ মারকার এবং মিঃ রবার্ট উভয়ের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, মাথায় করাঘাত করে বললো মিঃ মারকার সর্বনাশ হলো এই দন্ডে কেউ রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা বিমানটিকে বিধ্বস্ত করলো, নইলে বিমানটির সবকিছু ভাল ছিলো। কারণ বিমানটি আকাশে উড়বার পূর্বে সব ভাল ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। উঃ! কি সর্বনাশ হয়ে গেলো......

মিঃ রবার্ট শুধু হিরোইন ব্যবসায়ী বা প্রস্তুতকারকই ছিলোনা। সে এই কোম্পানীর একজন পার্টনার ছিলো। প্রতিমাসে তার আয় ছিলো কয়েক কোটি টাকা।

হিরোইনবাহী এই বিমানটি ধ্বংস হওয়ায় তাদেরই শুধু ক্ষতি সাধন হলোনা। ইথোল শহরে আরও কয়েকজন ধনকুবের এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলো।

বিমানটি ধ্বংস হবার পর পরই সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। শিশু খাদ্য বহনকারী বিমানটি বিধ্বস্ত হছে উড্ডয়নের পর পরই। সর্বসাধারণ যারা তারা আফসোস করতে লাগলো। অনেকেই চোখের পানি ফেললো পাইলট নোমান এর জন্য। দক্ষ পাইলট হিসাবে নোমান নাম করেছিলো চরমভাবে। সুদীর্ঘ সময় ধরে নোমান ও হাইসানলু এরা দু'জন পাইলট শিশু খাদ্য এবং ইথোলের অতি পরিচিত ফলমূল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দিতো।

দু'জন পাইলট একই সঙ্গে মালবাহী বিমানটিতে ছিলো। এদের গন্তব্যস্থান ছিলো। কয়েকটি দেশ। আরাকান বিমান বন্দরে অবতরণের পর বিমানটি যাবে ফাংহা তারপর দবিরা বিমান বন্দর, এর পর কান্দাই সেখান থেকে ইদুনিয়া। বহু মালামাল ছিলো তাদের বিমানে। এ সব যে যে ঘাটিতে যাবে তাদের সঙ্গে ওয়ারলেসে আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে, মালামাল হাতে পেলেই তারা অর্থ পেমেন্ট করবে। কিন্তু সর্বনাশ হলো, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ায় মিঃ মারকার মাসা এবং কোম্পানীর পার্টনার গণের মাথায় বজ্রপাত হলো। শেয়ারে ছিলো ইথোলের

সব চেয়ে ধনকুবের লইমান মুছা। সংবাদটা মুহূর্তে তার কানে পৌঁছলো। মিঃ মুছা ছুটলো তার গাড়ি নিয়ে, এতো বড় ঘটনা ঘটে গেলো। হিরোইন পাচারকারীগণ একেবারে মুষড়ে পড়লো ভীষণভাবে। তারা ঘটনা স্থলে পৌঁছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো।

নূর তার যানে বসে সব দেখছিলো।

হিরোইন বোঝাই বিমানটির বিধ্বস্ত অংশগুলিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিলো, তখনও। ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি থেকে পানি দেওয়া হচ্ছে এবং উদ্ধারকারীগণ পাইলট ও তার সহকারীদের লাশ উদ্ধার কাজে ব্যস্ত।

. বনহুর ফিরে এলো যানে এবং নূরের পাশে দাঁড়িয়ে যানের টেলিভিশন ক্যামেরায় সে সব দেখলো। এবার বললো বনহুর প্রথম কাজ সমাধা হলো। এবার দ্বিতীয় কাজ। হিরোইন প্রস্তুত ঘাটিটি বিধ্বস্ত না করা পর্যন্ত আমাদের ছুটি নাই নূর। মেরীকে এবার সরাতে হবে।

বললো নূর আমি প্রস্তুত আছি।

বনহুর অপর একটি সুইচ টিপলো। হিরোইন প্রস্তুতকারী ঘাটি এবং বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি নজরে পড়লো এবার। শ্রমিকগণ কাজ করে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড এর কন্যা মেরীকে তার পিতার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। শয়তান মিঃ রবার্ট জানতো মেরী তার পিতার সঙ্গে সহযোগীতায় দক্ষ ছিলো তাই নানাভাবে মেরীকে হাত করেছে এবং তার দ্বারা হিরোইন তৈরির ব্যাপারে পুরা সাহায্য লাভ করে আসছে। মেরীর দ্বারা তারা উপকৃত এ কারণে মেরীকে হিরোইন পাচারকারী দল সম্মানে আদর যত্ন দিয়ে আসছে। মিস্ মেরীকে যতই সম্মানে রাখা হোক না কেন তার উপর ছিলো করা দৃষ্টি দল নেতাদের। বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ডকে তারা আটক করে তাদের কাজে লাগাতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাতে বিফলকাম হওয়ায় তার কন্য মিস মেরীকে অপহরণ করে গোপন স্থানে আটক রাখে তাকে কৌশলে কাজে লাগায়।

ইথোলের হিরোইন প্রস্তুতকারী দলের দলনেতাগণ অত্যন্ত ধূর্ত এবং চতুর। এরা জানতো দস্যবনহুর তাদের পিছু লেগেছে। সে তাদের হিরোইন প্রস্তুত কারখানা সম্বন্ধে সবকিছু জানে আর জানে বলেই বনহুর সরিয়ে নিয়েছে বৈজ্ঞানিক মার্শালকে। এ কারণে কান্দাই শহরে তাদের আনাগোনা। বনহুরকে কোন ক্রমে

হাতের মুঠায় পেলে তাকে তারা হত্যা করবে। জীবিত রাখলে তারা কিছুতেই নিশ্চিন্ত নয়। হিরোইন দ্বারা তারা শুধু লাভবানই হচ্ছে না তাদের কার্যসিদ্ধিও হচ্ছে। যুব সমাজকে অকেজো পঙ্গু করে রাখাই হলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই সংগ্রাম এইসব নরপশু দলের। শুধু ইথোল মাংলই নয় বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ যাতে আর মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে এটাই হলো তাদের কাজ। বিভিন্ন বিদেশী স্বার্থান্বেষীমহল বিভিন্ন মাদকদ্রব্য দ্বারা যুব ও তরুণ সমাজের মস্তিস্ক বিকৃত করার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর।

বনহুর বললো–নূর আর বিলম্ব করা উচিত হবেনা। তুমি যাও হিরোইন প্রস্তুতকারী কারখানায় মিস মেরী এখন তার গবেষণাগারে একা আছে।

হ্যাঁ আমি তাই ভাবছি-বললো নূর।

বনহুর বললো–আমি যানে অবস্থান করছি তুমি মিস মেরীকে কৌশলে কারখানার বাইরে নিয়ে আসবে। আমি তৎক্ষণাৎ আমাদের যান থেকেই রিমোর্ট কন্ট্রোল দ্বারা সব ধ্বংস করে ফেলবো।

নূর যান থেকে নেমে বনহুরকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়লো। কিছুটা অগ্রসর হতেই বনহুর যানের টেলিভিশন ক্যামেরার সুইচ টিপলো। দেখতে পেলো লুনা পর্বতের অদূরে একটি গাড়ি ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির মধ্যভাগে তিন জন লোক বসে কি যেন আলাপ-আলোচনা করছে। লোক তিন জনের এক জন পরিচিত মুখ অপর দু'জন অপরিচিত। এরা যে কোন দুষ্ট মতলব নিয়ে গাড়িতে বসে আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। লোক তিন জনের চেনা মুখ মিঃ রবার্টের। বনহুর বুঝতে পারলো তাদের যানটির সন্ধান এরা পেয়েছে এবং তারা কোন অভিসন্ধি নিয়েই অপেক্ষা করছে।

বনহুর আপন মনে হাসলো।

রিমোর্ট কন্ট্রোলটি তুলে নিলো হাতের মুঠায়। মিঃ রবার্ট ও তার সঙ্গী দু'জনকে এই মুহূর্তে গাড়িসহ বিধ্বস্ত করতে পারবে।

মিঃ রবার্টের আয়ু শেষ সে এখনও জানেনা।

নূর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

বনহুর রিমোট কন্ট্রোলের সুইচ টিপলো। মুহূর্তমাত্র গাড়ি সহ প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটলো। চারদিকে গাড়িখানা এবং তার মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তি এক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। সেকি বিস্ময়কর বিস্ফোরণ। বনহুর আপন মনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। বললো সে মিঃ রবার্ট তোমার সব কারসাজি ধূলিস্যাৎ হলো। কোটি কোটি যুব ও তরুণ দলের সর্বনাশ করে ধনকুবের হয়েছিলে এবার তোমার দেহটা কেউ সনাক্ত করতেও সক্ষম হবেনা, তোমার শেষ পরিণতি এতো নির্মম হবে এটা আমিও ভাবতে পারিনি।

ওয়ারলেসটা তুলে নিলো বনহুর......হ্যালো মিঃ মারকার তোমার প্রিয় পার্টনার মিঃ রবার্ট তার সঙ্গী দু'জনসহ গাড়ি নিয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। তারপরই হাসির শব্দ ভেসে আসে তার কানে।

মিঃ মারকার একেই ভেঙে পড়েছিলো হঠাৎ তার রিসিভারে ভারী গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং হাসির শব্দে বললো মারকার-কে, কে তুমি এ কথা মোটেই আমি বিশ্বাস করিনা। মিঃ রবার্ট এতো বুদ্ধিহীন নয়। কেউ তাকে এভাবে নিহত করতে পারবেনা...

লুনা পর্বতের অদূরে একটি সমতল ভূমিতে তাদের কুকর্মের প্রতিফল হিসাবে সমাপ্তি ঘটেছে বললো বনহুর।

মিঃ মারকার বিমান বন্দরে তার চেম্বারে বসে শুনছিলো। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিলো না তার। তবুও বিশ্বাস না করেও উপায় ছিলো না কারণ ইথোল বিমান বন্দরের অদূরে কয়েকদিন পূর্বে তাদেরই মালামালবাহী বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পর একটা ভীতিভাব জাগরিত হচ্ছিলো হিরোইন পাচারকারীদের মনে। কোন এক মহাশক্তি তাদের হিরোইন প্রস্তুত ঘাটির সন্ধান পেয়েছে এবং সেই মহাশক্তিই তাদের কোটি কোটি টাকার মালামালসহ বিমানটিকে উড্ডয়নের পরপরই বিধ্বস্ত করেছে। অত্যন্ত সুকৌশলে মিঃ মারকার ও মিঃ রবার্ট এই মহাশক্তিটির চালককে খুঁজে বের করার জন্য সন্ধান করে ফিরছিলো। গাড়ি ও সঙ্গীদেরসহ মিঃ রবার্ট নিহত হবার সংবাদ মিঃ মারকার প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। কে এই ব্যক্তি যে এইমাত্র তার সঙ্গে ওয়ারলেসে কথা বললো, মিঃ মারকারের কপালের দু'পাশের রগগুলো টন টন করে উঠলো।

মিঃ মারকার মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। গাড়িতে আরোহণের পূর্বে তাদের হিরোইন পাচারকারীদের অধিনায়ক ধনকুবের

মিঃ লইমান মুছাকে ঘটনাটা জানিয়ে দিলো এবং মিস্ মেরীকে গবেষণাগার থেকে সরিয়ে নেওয়ার ইংগিত দিলো, বললো মিঃ মারকার সন্দেহ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ডই এই মহাশক্তির অধিনায়ক। কাজেই মিস মেরীকে সরিয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মিঃ মুছার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, মিঃ রবার্ড ছিলো তাদের ব্যবসার প্রাণ, কারণ মিঃ রবার্ট হিরোইন প্রস্তুতকারক এবং বিভিন্ন দেশের হিরোইন ব্যবসায়ী মহল তার সঙ্গে লেনদেন করে আসছিলো। তার যোগাযোগ ছিলো সর্বস্তরের হিরোইন। ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে। এহেন ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ শুধু মিঃ মারকার ও মিঃ মুছাকেই বজ্রাহত করলোনা। তাদের দলের যারা জানলো তারা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো। মিঃ মুছা হিরোইন প্রস্তুতকারী গবেষণাগারের উদ্দেশ্যে ছুটলো। মিঃ মুছার সঙ্গে রইল হ্যারিসন ও ক্লাইভটন। এরা ভীষণ শক্তিশালী ব্যক্তি।

গাড়িখানা যখন হিরোইন প্রস্তুত ঘাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে ঘাটির কাছাকাছি পৌঁছে গেলো তখন বনহুর যানের ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখতে পেলো সবকিছু। ততক্ষণে নূরও পৌঁছে গেছে ঘাটির ফটকের কাছাকাছি।

গাড়িতে বসেই মিঃ মুছা ও তার সঙ্গীদ্বয় নূরকে লক্ষ করলো এবং পকেট থেকে শব্দ বিহীন দীর্ঘকৃত রাইফেল বের করে নিলো। নূর ততক্ষণে ফটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।

মিঃ মুছা সঙ্গীদের বললো তোমরা নেমে পড়ো। ঐ যুবকটিকে আমি চিনি। সে ও আরও একজন বেশ কিছুদিন হলো আমাদের ঘাঁটিতে শ্রমিকের কাজ করছিলো। ঘাঁটির ম্যানেজার ওদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে শ্রমিকের কাজ দিয়েছিলো। কিন্তু এদের বিশ্বাস করা তার মোটেই ঠিক হয় নাই। এদের কার্যকলাপ যত ভালই হোক না কেন; এদের মতলব ছিলো অন্যকিছু, যার জন্য আমাদের কারখানার সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। এরা অত্যন্ত চতুর, বুদ্ধিমান। ফলের বাক্স প্যাকেটিং এর কাজ করার ছলনায় ঘাঁটির অভ্যন্তরের সবকিছু জেনে নিয়েছে। এদের প্রতি আমার ও মিঃ রবার্টের সূতীক্ষ দৃষ্টি ছিলো। তবুও আমরা তেমনভাবে কিছু আবিস্কার করতে সক্ষম হইনি। সন্দেহ হচ্ছে এরা সাধারণ ব্যক্তি নয়। এদের চক্রান্তেই আমরা হারালাম কোটি কোটি টাকার মালামালসহ পাইলট নোমান এবং হাইসনলুকে-আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়। ঐ তো এগিয়ে যাচ্ছে যুবকটি, ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়…এই তো আমিও ছুঁড়ছি…

বনহুর তার যানে বসে টেলিভিশন ক্যামেরায় সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলো। বুঝতে পারলো নূর বিপদগ্রস্থ অথচ সে একটুও টের পায়নি। তাড়াতাড়ি নূরের পকেটস্থ ক্ষুদে ওয়ারলেসে জানিয়ে দিলো, নূর তোমাকে ফলো করে গুলি নিক্ষেপ করা হচ্ছে তুমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাশের দেয়ালের আড়ালে সরে দাঁড়াও....

নূর পিতা বনহুরের কণ্ঠ শুনতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালের আড়ালে আত্মরক্ষা করলো ঐ দন্ডে একটি গুলি বিদ্ধ হলো দেয়ালে যে স্থানে একটু পূর্বেই সে দন্ডায়মান ছিলো। পরপর দুতিনটে গুলি বিদ্ধ হলো দেয়ালে। নূর দেয়ালের আড়ালে আত্নগোপন করে সোজা ভিতরে প্রবেশ করলো তারপর দ্রুত এগুলো সিঁড়ির দিকে। একটি সিঁড়ি সোজা চলে গেছে ভূগর্ভে। নূর সেই সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলো নিচে।

কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলো। নূর তাদের মধ্যে নিজকে মিশিয়ে সেও কাজ করতে লাগলো।

ততক্ষণে ওরা গাড়ি থেকে নেমে যেখানে নূর সরে দাঁড়িয়ে আত্নরক্ষা করেছিলো ঐ স্থানে এসে পড়ে। তাদের হাতে ছিলো উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। তারা সিঁড়ির কাছে এসে একটু ভাবনায় পড়লো কারণ দুটো সিঁড়ির মুখ একই স্থানে, একটি উঠে গেছে উপরে আর একটি নিচে। কোনদিকে গেছে নূর এটা সহজে বুঝতে পারেনা। মিঃ মূর্ছা শক্তিশালী হ্যারিসনসহ উপরে উঠে গেলো। আর ক্লাইভটন গেলো নিচের সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভে। শ্রমিকগণ আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যেই নূরও কাজ করে যাচ্ছে। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবেনা। ক্লাইভটানও নূরকে চিনতে পারলোনা। সে খুঁজে ফিরতে লাগলো।

নূর লক্ষ করলো ক্লাইভটনকে। কারণ ক্লাইভটনকে চিনতো, এই লোকটা মাঝে মাঝে হিরোইন প্রস্তুত কারখানায় আসা যাওয়া করতো। এই ক্লাইভটন শুধু দুর্দান্ত শক্তিশালীই ছিলোনা, সে কুমতলব নিয়ে চলতো। কারখানার সবাই তাকে ভয় করতে ভীষণভাবে।

ভূগর্ভেই ছিলো মিস্ মেরীর গবেষণাগার। মেরী তার গবেষণাগারে মনোযোগ সহকারে কাজ করছিলো।

নূর ক্লাইভটনের সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়লো এবং সবার অলক্ষে প্রবেশ করলো মিস মেরীর গবেষণাগারে।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো মেরী, নূরকে দেখামাত্র ভীষণভাবে চমকে উঠলো। বললো, এখানে কি চাও তুমি?

নূর বললো–মিস্ মেরী আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। এই মুহূর্তে বিলম্ব না করে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসুন।

মেরী বিস্ময় ভরা গলায় বললো–কোন সাহসে তুমি এমন কথা বললে? তোমাকে আমি চিনি।

হাঁ আমি এই কারখানায় শ্রমিকের কাজ করি। বললো নূর।

আমি তোমাকে ভালভাবেই চিনি। প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিলো, তোমরা দু'জন কোন অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে এখানে। কেন যে তোমাদের বিশ্বাস করলো মিঃ লইমান মুছা বুঝতে পারছি না।

নূর মিস মেরীর কথায় কান না দিয়ে বললো মিস মেরী এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে বেরিয়ে চলুন। যদি বিলম্ব করেন তবে মৃত্যু অনিবার্য কারণ এই হিরোইন প্রস্তুত কারখানার অভ্যন্তরে ডিনামাইট বসানো হয়েছে। রিমোর্ট কন্ট্রোল দ্বারা এই কারখানার অস্তিত্ব বিধ্বস্ত হয়ে যাবে......আমি আপনার পিতা বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড এর কাছে আপনাকে পৌঁছে দেবো।

মিস মেরী এক অজানা যুবকের মুখে তার পিতার নাম শুনে বিস্মিত হলো এবং বললো বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ডকে তুমি চেনো? কোথায় তিনি?

আছেন এবং ভালই আছেন। আমরা তার হিতাকাঙ্খী এ জন্যই আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দেবো।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি আছে? তোমাকে যদি বিশ্বাস না করি?

তবে আমি উপায়হীন। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো তোমার পিতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই এসেছি। যদি না যাও আমার সঙ্গে তা হলে তোমাকে আর

ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। এই ঘাঁটিটি ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও অস্তিত্ব মুছে যাবে। চলো আমার সঙ্গে...।

এবার মিস মেরী নূরের কথায় কিছুটা বিশ্বাস আনলো এবং পিছনের গোপন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

এই সময় নুর ও মিস মেরীর কানে ভেসে এলো মিঃ লইমান মুছার হাসির শব্দ, কোথায় পালাচ্ছে মিস্ মেরী! জানো পালানোর পথ বন্ধ।

মিস মেরী এবং নুর অবাক হলো। শব্দটা কোন সাউন্ডবক্স থেকে আসতে আর ঠিক তাদের মাথার উপরেই মনে হচ্ছে। তবে কি মিঃ মুছা তাদের গতি বিধি ঠিক অনুধাবন করে নিয়েছে।

নূর চাপা কণ্ঠে বললো কিন্তু এখান থেকে আমাদের বের হতেই হবে মিস মেরী। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ঘাটি সমূলে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে।

মেরী বললো এই দিকে আরও একটা পথ আছে সেটা অত্যন্ত দুর্গম পথ।

হোক চলো সেই পথেই চলো মেরী...নূর কখন নিজের অজান্তেই মিস মেরীকে তুমি বলে সম্বোধন করে ফেললো।

মেরী মিঃ মুছার বিকট অট্টহাসিকে উপেক্ষা করে নূরের হাত ধরে গুপ্ত পথে অগ্রসর হলো। এটা আসলে কোন পথ নয় গ্যাস পাইপ চলে গেছে বাইরের দিকে। নিচে আরও নানা ধরনের যন্ত্রপাতি রয়েছে।

অতি সাবধানে পাইপের রড ধরে দুজন এগুতে লাগলো।

ভীষণ ধূম্ররাশি এ পথ অন্ধকারময় করে তুলেছে। একটু পা পিছলে গেলে একেবারে নিচে পড়ে যাবে যেখানে গরম পানি টগ বগ করে ফুটছে।

নূর আর মেরী পাইপ বেয়ে এগুতে লাগলো।

হঠাৎ প্রচন্ড ঝাঁকুনি শুরু হলো পাইপগুলিতে। পরপর গুলির শব্দ। মেরী পড়ে যাচ্ছিলো-র খপ করে হাত ধরে ফেললো তারপর তুলে নিলো পাইপের উপরে। তখনও পাইপ গুলো কাঁপছে, নূর মেরীকে আঁকড়ে ধরে রইলো।

একটু হলেই গুলি এসে বিদ্ধ হতো নূরের দেহে।

কিছুটা এগুলো অতি কষ্টে।

তারপর একটি সিঁড়ি ভূগর্ভ থেকে উপরে উঠে যাবার জন্য। ঐ সিঁড়ি বেয়ে নূর আর মেরী উঠে এলো উপরে। এখানে অনেক গুলো মেশিন চলছে, নূর ঐ মেশিনের ফাঁকে পা রেখে মেরীকে টেনে তুলে নিলো। তারপর ছুটলো এক পাশে। হঠাৎ একটা দরজা নজরে পড়লো নূর এর। নূর সেদিকে যেতেই মেরী বললো ওদিকে যেওনা। ঐ পাশে বিষাক্ত গ্যাস বেরুনোর পথ। মুহূর্তে মারা পড়বে......

নূর ভাবছে কোন পথে যাবে। মেরীর সাহায্য প্রয়োজন আছে। মেরীকে লক্ষ্য করে থোক আমাদের বাইরে যেতে হবে। বহু কষ্টে বাইরে। আসতে সক্ষম হলো মেরী আর নূর।

মিঃ মুছা ভাবছে বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড এর কন্যা মিস মেরী ও ঐ যুবকটি মেশিন ঘরের আড়ালে আত্নগোপন করেছে। যুবকটি কোন ষড়যন্ত্রকারী দলের হবে, তাই ওকে আটক করা একান্ত দরকার মনে করলো মিঃ মুছা। তাই লৌহফটক বন্ধ করে দিলো এবং গোপন পথগুলিতে মৃত্যুজাল ঝুলিয়ে দিলো। কোনক্রমে বাইরে বেরুতে গেলে এই মৃত্যুজালে আটকে পড়বে এবং কারেন্টের সর্ট লেগে মৃত্যুবরণ করবে।

কিন্তু নূর ও মিস মেরী তার পূর্বেই হিরোইন প্রস্তুতকারী ঘটির বাইরে এসে পড়লো।

ঘাটির সম্মুখে গেটের অদুরে বড় ফটকে দাঁড়িয়ে ছিলো মিঃ মুছার গাড়ি। মিঃ মুছা ও তার সঙ্গীদ্বয় নেমে যাবার সময় ভুল বশতঃ গাড়ির দরজায় চাবি আটকানোর কথা ভুলে তারা নেমে পড়ে। তাদের লক্ষ্য ছিলো নূরকে গুলিবিদ্ধ করা।

নূর আর মিস মেরী সেই গাড়িখানার পাশে এসে বুঝতে পারলো গাড়ির দরজা খোলা আছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে নূর গাড়ির দরজা খুলে ধরলো এবং বললো– উঠে পড় মেরী আর এক সেকেন্ড বিলম্ব করা উচিৎ হবে না। নূরের পকেটে ক্ষুদে ওয়ারলেসে বনহুর যান থেকে সংকেত দিচ্ছে।

মেরী বুঝতে পারে না এ যাত্রা তার জন্য শুভ না অশুভ হবে। তবু ঈশ্বরকে স্মরণ করে মেরী আসনে উপবেশন করলো।

নূর ড্রাইভিং আসনে বসেই ষ্টাট দিলো গাড়িতে।

উল্কা বেগে ছুটলো গাড়িখানা।

কিন্তু মিঃ মুছা ও তার সঙ্গীদ্বয় তার পূর্বেই গাড়ির গতি পথে বাধার সৃষ্টি করলো কারখানার অভ্যন্তর থেকেই সুইচ টিপে। গাড়ি থেমে গেলো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই। নূর বুঝতে পারলো এটা চক্রান্তকারীদের কারসাজি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লো ঠিক ঐ মুহূর্তে প্রচন্ডভাবে বিস্ফোরণ ঘটলো, হিরোইন প্রস্তুতকারী ঘাটির ভিতরে। সমস্ত ঘাটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে রাশিকৃত কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। পরপর বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো।

নূর বুঝতে পারলো তার পিতা বনহুর যানে বসে রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা হিরোইন প্রস্তুত ঘাঁটিটিকে সমূলে বিধ্বস্ত করলো। আনন্দে নূর হেসে উঠলো ভীষণভাবে।

মিস মেরী বললো–আমাদের মূল ঘাটি এভাবে ধ্বংস হলো আর তুমি হাসছো? কে তুমি? আমার মনে হচ্ছে এসব তোমার চক্রান্ত।

সব কথার জবাব পাবে মিস মেরী তবে এখন নয়, যদিও আমরা কিছুটা বিপদমুক্ত তবুও এ মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। মেরী এ কথা সত্য যে আমাদের একান্ত চেষ্টার ফলে এই ঘাটি বিনষ্ট করতে সক্ষম হলাম।

তোমরাই তা হলে……।

হাঁ আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এবার গাড়িখানা আর থেমে যাবেনা। আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবো।

নূর ড্রাইভ করে চললো।

মেরী বসলো তার পাশের আসনে।

পিছনে হিরোইন কারখানা থেকে কুন্ডলি পাকিয়ে ধূম্ররাশি আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হচ্ছে, সেকি শব্দ যেন এক একটা

বজ্রপাত।

নূর আর মেরীসহ গাড়িখানা উল্কা বেগে ছুটলো।

ওদিকে বনহুর যানে বসে দেখছে সবকিছু রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা ধ্বংস হলো ইথোলর হিরোইন প্রস্তুত ঘাটির অস্তিত্ব।

*

বনহুর ও নূর মেরীসহ ফিরে এলো কান্দাই।

বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড কন্যা মেরীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো। সেই আনন্দে আত্মহারা হলো বনহুর ও নূর।

বেশ কিছুদিন নূর না থাকায় মনিরা ভীষণ চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলো। সম্পূর্ণ একা সে এখন, পুরোন চাকর এবং বৃদ্ধ সরকার সাহেব ছাড়া এ বাড়িতে কেউ নেই।

মাঝে মাঝে মনিরা ভেঙে পড়ে, হাঁপিয়ে উঠে সে।

কখনও বাগানে বসে বৃদ্ধ সরকার সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। গল্প করে পুরোন স্মৃতি স্মরণ করে। হোসেন বহু পুরানো চাকর, চা-নাস্তা নিয়ে আসে সময়মত। তারও বয়স হয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে। মনিরাকে চিন্তিত দেখলে হোসেনের মনে শান্তি থাকে না। সেও কেমন মুষড়ে পড়ে, নূর বেশ কিছুদিন কান্দাই থাকায় মনিরা যখন খুব চিন্তাগ্রস্থ তখন হোসেনও ভীষণ চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

সেদিন ঘরে শুয়ে শুয়ে নূরের কথা ভাবছিলো মনিরা। এমন সময় গেটে একটি গাড়ি এসে থামলো। হোসেন উঁকি দিয়ে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলো, ছুটে এলো মনিরার ঘরে। উচ্ছল আনন্দে বললো–আপামনি ছোট সাহেব এসেছে। ছোট সাহেব এসেছে।

মনিরা খুশিতে ডগমগ হয়ে বললো–সত্যি।

হাঁ আপামনি সত্যি। ঐ যে গাড়ি এসেছে…

মনিরা বেরিয়ে আসতেই নূর এসে জড়িয়ে ধরলো-আম্মু আম্মু বড় ভাবনায় ফেলেছিলাম তাই না?

মনিরা নূরের চিবুকে আদর করে বললো–এতোদিন কোথায় ছিলি বাবা?

ইথোলতে...

সেখানে কেনো?

সে অনেক কথা ঘরে চলো সব বলছি।

মনিরা আর নূর এসে বসলো খাটে পাশাপাশি।

মনিরা বললো–কি যে ভাবনায় ফেলেছিলি নূর।

কেন আব্বু কি তোমায় বলে যায়নি?

বলেছিলো, হঠাৎ নূর ও আমি কোথাও যাবো কেনো যাবো তা জানিনা। ফিরে এলে সব জানবে...অথবা জানাবো...।

হাঁ আব্বু ঠিকই বলেছে যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে আমাদের জীবনের ঝুঁকি ছিলো। জানো আম্মু সেই বিস্ময়কর যানটি আমাদের বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো ইথোলতে এবং শেষ অবধি কার্যদ্ধার হবার পর ফিরিয়ে এনেছে কান্দাই শহরে। আম্মু তুমি শুনলে খুশি হবে যে কাজে আমরা গিয়েছিলাম সে কাজ আমরা সমাধা করতে পেরেছি।

কি এমন কাজ যা কষ্ট সাধ্যছিলো?

ইথোল মাংলতে হিরোইন প্রস্তুতকারী কারখানা ছিলো। এই কারখানার মালিক ছিলো কয়েকজন ধনকুবের ইথোল বাসী। তারা অর্থের লোভে এবং কোন এক গোপন অভিলাস পূর্ণ আশায় হিরোইন প্রস্তুত করে সমস্ত বিশ্বে নানাভাবে পাচার করে আসছিলো। এদের উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্বের যুব সমাজকে পঙ্গু করে দেওয়া।

হাঁ তোমার আব্বুর মুখে এই ধরনের কথা আমি শুনেছি। নূর সব কথা খোলসা বলল আমি সব বুঝতে পারবো। বললো মনিরা।

নূর বললো আম্মু আল্লাহর রহমতে এবং তোমার দোয়ায় ইথোলয় হিরোইন তৈরি ঘাটি সমূলে ধ্বংস করে এসেছি। আব্বুর প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। তবে একেবারে হিরোইন এবং বিভিন্ন মাদক দ্রব্য সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। জানিনা কোনদিন তা সম্ভব হবে কিনা।

মনিরা বিস্ময় ভরা গলায় বললো–নূর ভাবতে পারিনি এমন অসাধ্য কাজ তোমরা সমাধা করতে পারবে। কি ভয়ংকর ব্যাপার ইথোলর হিরোইন প্রস্তুতকারী ঘাটি বিশ্বের এক মতাশক্তি দ্বারা চালিত ছিলো এ কথা তোমার আব্বুর কাছে শোনা। যারা এই প্রস্তুতকারী ঘাঁটির পরিচালক তার শুধু ধনবানই নয় এক এক জন কুচক্রি ছিলো।

আব্বু রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা শুধু হিরোইন প্রস্তুতকারী ঘাঁটিই ধ্বংস করেনি। এই ঘাটি বা কারখানার মালিকগণও সমূলে ধ্বংস হয়েছে। তারাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে গেছে কারখানার বস্তুগুলির সঙ্গে। আর তারা ইথোলর বুকে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করে দেশ ও দশের সর্বনাশ করতে পারবেনা। এই সাফল্যের জন্য আল্লুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি আব্বুর সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে আমরা এ কাজ সমাধা করতে পারলাম। আব্বু ভাগ্যিস বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ডকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলো, তারই সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সৃষ্টি যানটি না হলে কিছুতেই সম্ভব হতোনা ইথোলর হিরোইন ঘাটি সমূলে ধ্বংস করা। আম্মু আর একটি খুশির কথা, আমরা বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড এর কন্যা মিস মেরীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি।

নূর সত্যি বৈজ্ঞানিক লর্ড এর জন্য মিস মেরীকে উদ্ধার করতে পেরেছিলে? তাকে এনেছো সঙ্গে করে কান্দাই?

হাঁ আম্মু মেয়েটি প্রথমে আমাদের বিশ্বাস করতেই চাইলোনা। পরে তাকে অনেক কষ্টে বিশ্বাস করাতে পেরেছি।

ওর বাবার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছো নূর!

হাঁ খুব খুশি হয়েছে বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড। মেয়েকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা তিনি। মার্শাল লর্ডের আশা পূর্ণ হয়েছে।

আমিও খুশি হয়েছি। বললো মনিরা। তারপর সন্তানকে ঘরে বসিয়ে নিজে তার নাস্তার আয়োজন করতে চলে গেলো।

*

আনন্দে ভরে উঠেছে বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড এর হৃদয়। তিনি ভাবতেও পারেননি মেরীকে ফিরে পাবেন। সেই মেরী আজ তার কাছে এসে পৌঁছে গেছে। বাবা বলে ডাকতে পারছে-এর চেয়ে কি আনন্দ তার থাকতে পারে।

ছোট শিশুর মত মেরীকে বুকে নিয়ে আদর করেন মার্শাল লর্ড। কন্যা মেরীকে ফিরে পাবেন সে আশা তার ছিলোনা যদিও বনহুর তাকে কথা দিয়েছিলো তার কন্যা মেরীকে ইথোল থেকে ফিরিয়ে আনবে এবং তার হাতে তুলে দেবে। কথাটা রক্ষা করতে পেরেছে বনহুর।

শুধু মেরীকেই ফিরিয়ে আনেনি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিকারক সর্বনাশের মূল হিরোইন প্রস্তুত ঘাঁটিটিও সমূলে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

পিতা-কন্যার মিলন দৃশ্য বনহুরকে অভিভূত করলো। একটু হেসে বললো–মিঃ লর্ড আপনার আশা পূর্ণ হয়েছে তো?

বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ড বললো–হ সব আশা আমার পূর্ণ। আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন এ জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে।

বললো বনহুর–নূরের সহযোগীতা ছাড়া কোনদিনই হয়তো সম্ভব হতোনা মেরীকে ঐ নর শয়তানদের কবল থেকে উদ্ধার করা এবং বিশ্বের মারাত্মক ক্ষতি কারক হিরোইন ঘাঁটিটি ধ্বংস করা। নূর সত্যিই আমাকে এ ব্যাপারে ভীষণ সহযোগীতা করেছে।

মেরী বললো–হাঁ বাবা তোমার বস যা বলছে সত্য। ঐ তরুণ শুধু আমার জীবন রক্ষাকারীই নয় সে তোমার আমার মিলন ঘটিয়েছে। তবে তোমার বস ছাড়া ওর পক্ষে সম্ভব হতোনা।

বললেন মার্শাল লর্ড–হাঁ সব জানি এবং বুঝি। বসকে অফুরন্ত আশীর্বাদ করছি, সত্যি মা তোকে পাবো এ যেন কল্পনায়ও ভাবতে পারিনি। আমার আশা পূর্ণ হয়েছে মা মেরী...

মেরীও আনন্দে আত্মহারা। পিতার বুকে মুখ রেখে অসীম শান্তি লাভ করে সে।

হিরা ঝিলের গভীর অতলে বৈজ্ঞানিক মার্শাল লর্ডের আবাসস্থল। বনহুর স্বয়ং তাকে সর্ব বিষয়ে সুখ শান্তিতে রাখার চেষ্টা করেছে যেন তার সাধনার কোন ত্রুটি না হয়।

*

বনহুর ফিরে এলো আস্তানায়।

ইথোলর হিরোইন প্রস্তুত কারখানা ধ্বংস করা বনহুর এর বিরাট সাফল্য। রহমানকে সমস্ত ঘটনা বলল বনহুর নির্জন বিশ্রামাগারে বসে। রহমান বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচর তাকে না বললে সবই যেন অপূর্ণ থেকে যায়। রহমান শুধু সহচর নয় বনহুরের পরম হিতাকাংখী সে। সর্দারের মঙ্গল কামনায় সে জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেনা কোনদিন।

রহমান সব শুনে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরে চুম্বন করলো। বললো–শুধু দেশ ও জাতির জীবন রক্ষার্থেই আপনি জয়ী হননি সর্দার। সমস্ত বিশ্ব আপনার কাছে ঋণি কারণ এই মাদক দ্রব্য আজ পৃথিবীর সর্ব স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। ইথোলর কুট চক্রের শিকার আজ যুব সমাজ। এইসব মাদক দ্রব্য বিশ্বের যুব সমাজের মেরুদন্ড ভেঙে দিচ্ছে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা-সমস্ত শক্তি হারিয়ে তারা আজ পঙ্গু অসাড়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো বনহুর–ইথোল মাংলোর হিরোইন তৈরীর মূল ঘাঁটি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছি বটে কিন্তু যে মাদক দ্রব্যগুলি দেশব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলো তো আর ধ্বংস করা সম্ভব নয়। গোপনে ঐ মাদক দ্রব্য পাচার হচ্ছে এবং তা যুব সমাজকে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রহমান তুমি কি স্বচক্ষে দেখেছো মাদক দ্রব্য সেবনকারী তরুণ বা ব্যক্তিদের?

সর্দার এ প্রশ্ন কেন করছেন?

জানি তুমি দেখোনি, কারণ তেমন সুযোগ আসেনি।

হাঁ এ কথা সত্য সর্দার।

তাহলে বারুই ক্লাবে যাও সেখানে দেখবে সে এক নির্মম করুণ দৃশ্য। এখানে শুধু তরুণ সমাজ নয়, এখানে নেশা করে অগণিত তরুণী। উচ্চ শিক্ষিত তরুণ তরুণী একত্রিত হয়ে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করছে। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য।

এদের দেখেও আপনি……

হাঁ, কোন প্রতিকার করা সম্ভব হয়নি। কারণ এরা মনুষ্য আচার-আচরণ থেকে সরে গেছে, এদের তুলনা হয় জীব জন্তুর সঙ্গে। এদের কোন সংজ্ঞা নেই। নেশা করে এক একজন চৈতন্যহীনভাবে পড়ে আছে, বিকৃত এদের চেহারা। ওদের সবাইকে গরু জবাই করার মত করে ফেললেও ওরা বুঝতে পারবে না। মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়ে নেশার যন্ত্রণা ওদের বেশি কষ্ট দিচ্ছে। রহমান অনেক অনেক ভয়ংকর কাজে তুমি আমাকে সহায়তা করেছে, এইবার তোমাকে দায়িত্ব দেবো, এইসব হিরোইন সেবনকারী তরুণ তরুণীদের জীবন বাঁচানোর জন্য তোমার সংগ্রাম করতে হবে। কান্দাই শহরে বাইরে এবং শহরতলিতে ছোট খাটো বিভিন্ন ধরনের কল-কারখানা, ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে দেবে। এরজন্য যত টাকা লাগবে আমার তহবিল থেকে গ্রহণ করবে। টাকার জন্য কিছু ভাববে না। একটু থেমে বললো বনহুর–একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে বেকার সমস্য এই দুটি মহাকাল সর্বনাশের মূল। দোষী আমাদের সমাজ, দোষী সমাজের মানুষ, যারা শুধু অর্থ সম্পদ নিয়ে মেতে আছে তারাই দোষী। তাদের বংশধরগণ কে কোথায় কি করছে, তারা কি চায়, কেমন থাকে বা আছে এসব লক্ষ্য করার সময় তাদের নাই। শুধু টাকার লালসায় সম্বিৎ হারা সবাই…একটু থেমে বললো বনহুর–এইসব ধনকুবেরুদের সন্তান রত্নদের সঙ্গে মিশে বেকার যুবকগণ ও নিজেদের পায়ে নয় মাথায় কুঠার ঘাত করছে। রহমান তুমি ওদের বাঁচার জন্য কিছু কল কারখানা তৈরি করে দাও। এতে দেশের সম্পদ বাড়বে আর বেকার তরুণ-তরুণীরা তাদের অবসর সময় কাটানোর জন্য হা-হুঁতাশ করে মরবেনা।

সর্দার আপনার নির্দেশ মতই আমি কাজ করবো।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চললো বনহুর আর রহমানের মধ্যে। রহমান মনোযোগ সহকারে সব শুনলো কারণ সর্দার যা বলবে সেই ভাবে তাকে কাজ করতে

জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়েও রহমান সর্দারের আদেশ পালন করেছে। দস্যুতা তাদের পেশা নয়, নেশা বলা যায় দীন হীন গরিব যারা তাদের মুখে হাসি

ফোঁটানোর জন্যই তাদের সংগ্রাম। দস্যু কালুখার কাছে তারা এ শিক্ষাই পেয়েছে।

বনহুর আর রহমান গুহা থেকে বেরিয়ে এলো ঐ মুহূর্তে কায়েস হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে সর্দারকে সম্মুখে দেখে কুর্ণিশ জানালো।

বললো বনহুর–কি সংবাদ কায়েস?

রহমানের চোখে মুখেও উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো। কারণ কায়েস কোন দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে।

কায়েস বললো–সর্দার ফুল্লরা ঝরনায় গোসল করতে গিয়ে সাঁতার কাটছিলো। এমন সময় কান্দাই ধনকুবের রাজা সিংহ জঙ্গলে শিকার করতে এসে কৌশলে তাকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে।

বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো ফুল্লরাকে রাজা সিংহ তার গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে! এতো বড় তার সাহস-একটু থেমে বললো সে- কতক্ষণ হলো এ ঘটনা ঘটেছে কায়েস?

এই তো একটু পূর্বে, আমি সংবাদ পেয়েই আমার ঘোড়া নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। গাড়িখানা এত দ্রুত শহরে প্রবেশ করলো আমি আর এগুতে পারলাম না। কারণ একটি নয় পাঁচটি গাড়ি জঙ্গলের বাইরে অপেক্ষা করছিলো। প্রত্যেকটা গাড়িতে প্রায় আট দশ জন লোক ছিলো তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তারা আমার ঘোড়াকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিলো। শহরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে স্বাভাবিক ভাবে গাড়ি চালিয়ে চললো যেন শহরবাসীগণ কিছু আন্দাজ করতে না পারে।

ভালই করেছ ফিরে এসে। এবার বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–রহমান বিলম্ব করা ঠিক হবেনা। আমি এক্ষুণি দেখছি…তাজকে প্রস্তুত করো।–

রহমান নত মস্তকে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর এবং কায়েস প্রবেশ করলো আস্তানায়।

নূরী একটা জামা সেলাই করছিলো। বনহুরের আগমনে তার মন আজ প্রফুল্ল আছে। কারণ ইখোলর ব্যাপার নিয়ে বনহুর আস্তানা ত্যাগ করার পর ভীষণ

দুঃশ্চিন্তায় ছিলো সে। বনহুর আর নূর কাজ সমাধা করে ফিরে আসায় নূরী বেশ আনন্দ বোধ করছিলো। বনহুরের মুখে জানতে পেরেছিলো সে ইথোল মাংলর সর্ববৃহৎ হিরোইন প্রস্তুত ঘাটি কারখানা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে বনহুরও নূর, এবং ধ্বংস করেছে। প্রস্তুতকারক প্রখ্যাত মিঃ রবার্ড মেরিন ও তার সহকারীগণকে। তবে প্রস্তুতকারকদের প্রায় সবাইকে নির্মূল করা হয়তো সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ জীবিত আছে তাতে কোন ভুল নাই।

নূরী এ সব নিয়েই ভাবছিলো। তার চোখের সামনে ভাসছিলো সেই দৃশ্য কিভাবে বনহুর আর নূর রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা ধ্বংস করেছে। কি ভয়ংকর সে ঘটনা, কি ভয়ংকর সে দৃশ্য।

এমন সময় বনহুর আর কায়েসকে উত্তেজিতভাবে সেখানে আসতে দেখে হাতের সেলাই স্থগিত রেখে বললো নূরী কি সংবাদ কায়েস?

কায়েস কিছু বলবার পূর্বেই বললো বনহুর–নূরী একটি দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ! বিস্ময় নিয়ে বললো নূরী।

বললো বনহুর–ফুল্লরার সংবাদ জানো?

না, কি হয়েছে তার?

কোথায় ফুল্লরা?

শুনলাম ঝরনায় গোসল করতে গেছে। কেন? কোন বিপদ ঘটেছে তার।

হাঁ

কি হয়েছে? কায়েস তুমি অমন নিশ্চুপ কেনো? উৎকণ্ঠা নিয়ে বললো নূরী।

কায়েস বললো–ফুল্লরাকে রাজা সিংহ তার গোসলের সময় তুলে নিয়ে গেছে।

বল কি কায়েস?

হাঁ নূরী। আমার মনে হয় সে এখনও মধ্য শহরে পৌঁছতে পারেনি।

তুমি যাবে হুর?

হাঁ, তাজকে প্রস্তুত করছে, আমি তোমাকে বলতে এলাম।

জানিনা কি ঘটবে! যাও হুর, তুমি যাও…ফুল্লরাকে নিয়ে ফিরে এসো।

বনহুর ড্রেস পরিবর্তন করে ফিরে এলো এবং কায়েসসহ বেরিয়ে গেলো আস্তানা থেকে।

নরী ভূগর্ভের গবাক্ষে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় কান্দাই জঙ্গলের পথ। নূরী নির্বাক নিস্তদ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইল বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে। যতক্ষণ অশ্ব পদশব্দ শোনা গেলো ততক্ষণ চেয়ে রইল। না জানি ফুল্লরাকে এতোক্ষণ কতদূর নিয়ে গেছে রাজা সিংহ। রাজা সিংহ কান্দাই এর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার প্রতাপে কান্দাই-এর দীন-হীন ব্যক্তিগণ ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ রাজা সিংহ অসহায় মানুষদের অসময়ে টাকা কর্জ হিসাবে দেয় এবং সুদে আসলে শুধু তিন ভাগ নয় কমপক্ষে দশ ভাগ আদায় করে নেয়। অনেককে সর্বহারা করে ছেড়েছে সে। রাজা সিংহের অনেক কাহিনীই নুরীর কানে এসেছিলো।

ভীষণ চিন্তিত হলো নূরী।

*

রাজা সিংহ ফুল্লরাকে সিক্ত অবস্থায় নিয়ে এলো তার বাগান বাড়িতে। দলবল সহ ফুল্লরাকে তারই ওড়নার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এলো, মুখে রুমাল গুঁজে দেওয়ায় একটু টু-শব্দ করতে পারলো না সে।

বিরাট রংমহল।

ঐ রংমহলে ফুল্লরাকে আটক করে রাখলো রাজা সিংহ।

রাজা সিংহের কাহিনী কে না জানতো, বহু লোকের সর্বনাশ করে সে আজ ধনাঢ্য ব্যক্তি। শহরের কেন্দ্রস্থল ছেড়ে সে বসবাস করে শহরতলিতে। বিরাট জায়গা নিয়ে তার বাড়ি, অদূরে বাগান বাড়ি ও রংমহল।

বহু লোককে পথের ফকির বানিয়ে রাজা সিংহ তার ঐশ্বর্যের ইমারত গড়েছে। সুন্দরী নারীদের রক্ষা ছিলো না তার ছোবল থেকে। অর্থের বিনিময়ে নইলে জোরপূর্বক সুন্দরী নারী তার চাই। শোনা যায় সুন্দরীদের সর্বস্ব হরণ করার পর তাকে হত্যা করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতো সে। এ কারণে শহরতলিতে জনগণের মনে ভীষণ একটা আতঙ্ক বিরাজ করতে সর্বক্ষণ। কোন আইন-শৃঙ্খলা মানতে না রাজা সিংহ। ঐ স্থানের প্রশাসনকে সে রেখে ছিলো হাতের মুঠায়।

এ কারণে প্রশাসনও তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রহণ করতো না।

এক বৃদ্ধের একটি সুন্দরী কন্যা ছিলো। বৃদ্ধার স্ত্রী বা কোন পুত্র সন্তান ছিলো না। বৃদ্ধ অতি কষ্টে দিন কাটাতে, অর্থের অভাবে কন্যার বিয়ে দেওয়া সম্ভবপর ছিলোনা।

রাজা সিংহের একজন সহকারী একদিন কোনক্রমে বৃদ্ধার কন্যা রানীর সন্ধান পায়, সে গিয়ে রাজা সিংহকে রানীর কথা বলে। রাজা সিংহের চোখ দুটো ক্ষুদ্ধ শার্দুলের মত জ্বলে উঠেছিলো। সেইদিন রাতে সে গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিলো শহরতলির সেই বাড়িতে। বৃদ্ধ আর তার মেয়ে রানীকে অর্থ দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো। তারপর বাগান বাড়ির রংমহলে রানীকে নিয়ে আবদ্ধ করে পিতাকে কিছু টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলো-তুমি বাড়ি যাও। তোমার মেয়ে কাল যাবে……হাঁ, যে টাকা দিলাম ঐ টাকায় মেয়ের বিয়ের যৌতুক দিও।

বৃদ্ধ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলো গ্যাসবাতির তীব্র আলোতে রাজা সিংহের মুখের দিকে।

হেসে বলেছিলো সেদিন রাজা সিংহ-তাকিয়ে দেখছো কি যাও বাড়ি যাও। টাকাগুলো সাবধানে রেখো যেন খোয়া না যায়। যাও আমার গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দেবে।

গাড়িতেই এসেছিলো আসার সময়, বৃদ্ধের দু’চোখে আনন্দ ধরেনা, কারণ মোটর গাড়িতে সে কোনদিন চলে নি। জীবনে এটাই তার প্রথম মোটর গাড়িতে চড়া তাই বড় খুশি লাগছিলো তার। রানীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলো লোকে যাই বলুক রানী রাজা সিংহ বড় হৃদয়বান লোক। কে এমন মহৎ ব্যক্তি আছে যে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকা দেবে। তোর সৌভাগ্য রানী…

কেন যেন রানীর কাছে ভাল লাগেনি তার বৃদ্ধ পিতার কথাগুলো। তাদের বাড়ির উঠানে রাজা সিংহ যখন পা রেখেছিলো তখন রানী কুপির আলোতে রাজা সিংহের চেহারা দেখে শিউরে উঠেছিলো। ভয়ে বুক তার টিপ টিপ করছিলো, তবুও যেতে হলো তাকে বৃদ্ধ পিতার কথায়।

বৃদ্ধ আলী ফিরে এলো সেদিন, কিন্তু মনে সে শান্তি পাচ্ছিলোনা। কুপিটা জ্বলে জ্বলে নিভে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় বসলো, তারপর হাতের টাকাগুলো বালিশের তলায় রেখে শুয়ে চোখ বন্ধ করলো। কিন্তু ঘুম এলোনা তার চোখে। রানীর মুখ খানা ভাসতে লাগলো তার চোখের সামনে। অসহায়া রানী, মা মরা ছোট্ট মেয়েটিকে কত কষ্ট করেই না মানুষ করেছিলো। সেই যে বিশ বছর আগের কথা সব আজ তার মনের আকাশে ভাসতে লাগল। এই দীর্ঘ সময়ে একটি দিন রানীকে ছাড়া কাটে নাই তার। রানী তার সংসারের একমাত্র সম্বল।

তারপর রানী আর ফিরে আসেনি রাজা সিংহের রংমহল থেকে। পরদিন অবশ্য বৃদ্ধ আলী পায়ে হেঁটেই চলে এসেছিলো রাজা সিংহের বাগান বাড়িতে।

কিন্তু ফটকের দারওয়ান তাকে বাগান বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়নি। মাথা ঠুকে অনুনয় বিনয় করেও আর আলী রাজা সিংহের রংমহলের দরজায় যেতে পারেনি।

দারওয়ান লাঠির আঘাত করে তাড়িয়ে দিয়েছিলো কুকুরের মত করে।

ফিরে এসে বৃদ্ধ আলী ক্ষান্ত হয়নি, পরদিন রাজা সিংহের দেওয়া টাকাগুলো নিয়ে আবার গিয়েছিলো। দারওয়ানকে টাকা গুলি ফেরৎ দিয়ে তার মেয়ে রানীকে ফেরৎ চেয়েছিলো। দারওয়ান সেদিনও তাড়িয়ে দিয়েছিলো, টাকা গুলো নিজের মুঠায় রেখে।

কদিন কেঁদে কেঁটে বৃদ্ধ আলীর কাটলো। ছুটে যায় সে রাজ সিংহের বাগান বাড়ির ধারে। অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে রংমহলের দিকে। দারওয়ানের পা জড়িয়ে ধরে করুণ কণ্ঠে অনুনয় বিনয় করতো ভাই আমাকে একবার নিয়ে চলো রাজা সিংহের কাছে। আমার মা রানীকে দেখবো, তাকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা। নিয়ে চলো ভাই আমাকে...

বৃদ্ধ আলীর করুণ কান্নার কোন ফল হলোনা।

তৃতীয় দিনে আলীর এক আত্মীয় এসে বললো–একটি ডোবার পাশে পড়ে আছে তার মেয়ে রানী কিন্তু সে প্রাণহীন।

আলী দিশেহারার মত ছুটলো সেই ডোবার দিকে। সেখানে এসে সে দেখলো অগণিত লোক ভীড় করে আছে, সবাই দেখছে রানীর ক্ষতবিক্ষত প্রাণহীন দেহটা।

ভীড় ঠেলে আলী ছুটে গেলো, লুটিয়ে পড়লো রানীর দেহটার উপর। দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। মা-মাগো রাজা সিংহ তোর একি অবস্থা করেছে...মা, মা, রানী, কথা বল মা এই দেখ কত লোক ভীড় করে দেখছে, ওগো তোমরা রাজা সিংহের বিচার করো। আমি গরিব অসহায় বৃদ্ধ, আমার একমাত্র মেয়ে রানী আমাকে রেধে খাওয়াতো। আজ কদিন আমার ঘরে আগুন জ্বলেনি, আমার পেটে দানা পানি পড়েনি, আমার মা নেই ঘরে-কে আমার পেটের দিকে তাকাবে..মা, মা-রাণী...বৃদ্ধ আলীর কান্নায় ভরে উঠলো চারিদিক। জনগণ দাঁড়িয়ে রইল স্থবিরের মত। কেউ একটি কথা বলার সাহস পেলোনা রাজা সিংহের ভয়ে, কারো টু শব্দটি করার মত ক্ষমতা ছিলো না।

এ সংবাদ কোনদিন কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ পেলোনা বা পুলিশ মহলেও নাড়া দিলোনা।

বৃদ্ধ আলী পাগল হয়ে গেলো।

রাজা সিংহর বাগান বাড়িতে যেয়ে সে দারওয়ান-এর গলা টিপে ধরলো, কেন যেতে দাওনি সেদিন রংমহলে। আমার রানীকে হত্যা করেছিস তোরা।

রাজা সিংহের সহচরগণ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছাড়িয়ে নিতে গেলো কিন্তু পারলো না। বৃদ্ধ আলীর শরীরে আজ হিংস্র ব্যাঘ্রের শক্তি। সে দারওয়ান এর এমন জোরে গলা টিপে ধরলো যে তার চোখে মুখে রক্ত বেরিয়ে এলো। যারা দারওয়ানকে বৃদ্ধ আলীর হাত থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলো তারাও ব্যর্থ হলো। যা সে হাতের কাছে পেলো তাই নিয়ে আক্রমণ চালালো। ভয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো তারা।

সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটা দিলো রাজা সিংহের কাছে।

রাজা সিংহতো ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তক্ষুণি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলো।

আলী তখন ক্ষুদ্ধ ব্যাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজা সিংহের উপর। রাজাসিংহ তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো, একেবারে আলীর বুক লক্ষ্য করে। শুধু একটা তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো বৃদ্ধ আলী। আর সে চোখ মেললো না।

শুধু আলী নয় বহু নিরীহ মানুষের বুকের রক্ত শুকিয়ে আছে বাগান বাড়ির আঙ্গিনার আশে পাশে।

বৃদ্ধ আলীকে গুম করে দিলো রাজা সিংহের সহকারীগণ।

আর কোন দিন আলী ফিরে গেলোনা তার পর্ণ কুটিরে।

*

গভীর রাত।

বাগান বাড়ির প্রাচীর টপকে রংমহলের দরজায় এসে দাঁড়ালো বনহুর। দেহে তার জমকালো ড্রেস, মাথায় কালো পাগড়ীর আঁচলে মুখ মন্ডলের অর্ধেক আবৃত। দক্ষিণ হস্তে জমকালো পিস্তল।

রংমহলের ভিতর থেকে ভেসে আসে ফুল্লরার করুণ আর্তনাদ ছেড়েদে আমাকে......ছেড়েদে......আমি তোর মেয়ের মত...

অট্টহাসি শোনা যায় রাজা সিংহের, তার সঙ্গে শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর-তুমি বনফুল। তোমার সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করেছে। এসো তুমি, এসো সুন্দরী, আমার কাছে এসো। যা চাও তাই।

বনহুরের চোখ দুটো অগ্নি গোলকের মত জ্বলে উঠলো। সে দৃঢ় ভাবে চেপে ধরলো পিস্তলখানা। মুখমন্ডল তার কঠিন হলো।

ওদিকে ফুল্লরার করুণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর কাঁচের শার্শী ভেঙে প্রবেশ করলো রংমহলের ভিতরে আক্রমণ করলো রাজাসিংহকে। ফুল্লরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বনহুরের বুকে-বাবুজী...বাঁচাও বাপুজি...

বনহুর বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরলো রাজা সিংহের গলা তারপর শুরু হলো ধস্তা ধস্তি। রাজাসিংহ বললো–কে তুমি কি চাও…

বললো বনহুর–তোমার জীবন…আর আমি তোমার যমদূত।

তুমি-তুমি বনহুর?

হাঁ। এতোদিন ধরে তোমার কার্য কলাপের বহু ঘটনা শুনেছি কিন্তু সময়ের অভাবে আসতে পারিনি……আজ তুমি আমার কন্যা সমতুল্য ফুল্লরাকে ধরে এনেছো। তোমার লালসা পরিপূর্ণ করার জন্য। আজ তোমার রক্ষা নাই।

তুমি আমাকে হত্যা করবে কিন্তু পারবে না। রংমহলের চারপাশে ঘিরে আছে অসংখ্য প্রহরী……।

তা তো বুঝতেই পারছি, তোমার প্রহরীগণ নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। নইলে আমি কিভাবে প্রবেশ করলাম তোমার রংমহলে। এবার বনহুর তার পিস্তলটা উদ্যত করে এগুলো রাজা সিংহের দিকে বললো–ওরে নরাধম তোমাকে এই মুহূর্তে হত্যা করতে পারি কিন্তু তাতে আমার তৃপ্তি হবেনা কারণ এতো সহজ মৃত্যু তোমার প্রাপ্য নয়। তোমার চোখ দুটি উপড়ে নিবো তারপর হাত দু'খানা অকেজো করবো, হা জীবিত থাকবে তুমি…কান্দাই জনগণ তোমার জন্য যেন ব্যথা অনুভব করে।

হাঁ হয়ে গিয়েছিলো রাজা সিংহ। দু'চোখে সে শর্ষে ফুল দেখছে। রাজা সিংহ জানে বনহুর যেমন কঠোর তেমনি দয়ালু কিন্তু সেকি এ মুহূর্তে তার দয়া পাবে।

বনহুর শিস দিলো সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের দু'জন অনুচর মংলু আর হারেশ প্রবেশ করলো দরজা দিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো ফুল্লরা। একটু পূর্বে সে ভীষণ অসহায় বোধ করছিলোবনহুরকে দেখবামাত্র তার সাহস পূর্ণভাবে জেগে উঠেছিলো। হাজার হলেও তার দেহে বন্য জীবের রক্তের মতই সাহসী রক্তের প্রবাহ ছিলো। সর্দার শিস দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফুল্লরা দরজা খুলে দেয়।

মংলু ও হারেশ প্রবেশ করে।

বনহুর ইংগিত করে রাজা সিংহকে বেঁধে তাদের অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিতে।

বনহুর ফুল্লরা সহ বেরিয়ে যায়।

ওরা তখন বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

ঠিক মুহূর্তে জাভেদ ফুল্লরার ঘটনা শুনে তার অশ্ব নিয়ে এসে হাজির হয় রাজাসিংহের বাগান বাড়িতে। সেও প্রাচীর টপৃকে প্রবেশ করলো ভিতরে।

বনহুর প্রহরীগণের অলক্ষ্যে কৌশলে প্রবেশ করেছিলো এবং নিঃশব্দে রাজাসিংহকে স্বশরীরে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। প্রহরীগণ যেমন ঝিমাচ্ছিলো তেমনি বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো। একটুও টের পায়নি।

জাভেদের অশ্ব পদশব্দে জেগে উঠে রাজসিংহের প্রহরীগণ। তারা টের পায় কেউ বাগান বাড়িতে প্রবেশ করেছে। এতোক্ষণে যেন হুস হয়েছে সবার। বনহুর তার অনুচরদের দ্বারা রাজাসিংহের প্রহরীগণকে সুগন্ধ গ্যাস ছড়িয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। গ্যাসের মোহ কেটে যাওয়ায় তারা সজাগ হয়ে উঠেছে। এবার তারা ঘিরে ফেলে রংমহল।

রংমহলের ভিতরে প্রবেশ করে জাভেদ হতভম্ব হলো, কাউকে দেখতে পেলোনা। রাজাসিংহ বা ফুল্লরা কেউ তো নেই সেখানে। বুঝতে পারলো সর্দার তাকে নিয়ে গেছে। জাভেদ যখন জঙ্গল থেকে ফিরে শুনলো ফুল্লরাকে রাজাসিংহ শিকার করতে এসে ধরে নিয়ে গেছে। কথাটা শোনামাত্র সে তার অশ্ব নিয়ে ছুটেছিলো। রাজাসিংহের বাগান বাড়ি তার চেনা ছিলো। একবার মকবুল তার পিতার বিশ্বস্ত অনুচর সে জাভেদকে নিয়ে ঐ বাগান বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলো, তবে রাতের অন্ধকারে– দেখেছিলো সেদিন, তবুও ভুলে নাই জাভেদ। তার ইচ্ছা ছিলো বাগান বাড়ির ভিতরে রংমহলটা দেখবে একবার। আরও শুনে ছিলো রাজাসিংহ রংহমহলের রহস্যপূর্ণ কাহিনী। ঐ রংমহলে রাজাসিংহ কান্দাই অঞ্চলের বহু সুন্দরী নারীকে অপহরণ করে এনে নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ করে রাত কাটায়। তারপর তাকে হয় হত্যা নয় কোন অজ্ঞাতস্থানে লুকিয়ে রাখে। এ সকল কথা স্মরণ করেই জাভেদ ছুটে এসেছিলো রংমহলে। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হয়ে সে তার অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো, যদিও রহমান বলেছিলো-জাভেদ যাসনে। সর্দার স্বয়ং গেছে তার উদ্ধারে। তুই গেলে কোন বিপদ আসতে পারে।

রহমানের কথাই সত্য হলো।

জাভেদ ছিলো হিংস্র প্রাণীর মত, তবে কৌশল তার কিছুই জানা ছিলোনা। বনহুর যেমন শিক্ষিত তেমনি সর্বগুণে গুণবান। এমন কোন শিক্ষা তার অজানা ছিলো না; যা সে জানতোনা, এ সব গুণ লাভ করার প্রথম ধাপ ছিলো তার শিক্ষা। যে কোন যান চালনায় সে ছিলো দক্ষ। সকলপ্রকার ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলো বনহুর। তাই সে বহু ভাষা জানতে এবং বুঝতো। কালু খাঁ দস্যু হলেও বনহুরকে সে সর্বদিকে শিক্ষা-দীক্ষায় আদর্শ করে গড়ে তুলেছিলো। সে নিঃসন্তান ছিলো কিন্তু সন্তান হিসাবে বনহুরকে কালু খাঁ স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বড় করেছিলো এবং তাকে করেছিলো দুর্জয় সাহসী। গহণ জঙ্গলে কালু খাঁ আত্নগোপন করে হিংস্র জীব-জন্তুর সঙ্গে খেলা করতে দিতো, যেন বনহুর হিংস্র ব্যাঘ্র অথবা সিংহ শাবককে বশীভূত করতে পারে। পারে বনহুর হিংস্র শাবক নয় বড় বড় ব্যাঘ্র এবং সিংহকেও কাহিল করে জয় লাভ করতে।

তখন কালু খাঁ বেরিয়ে আসতো আড়াল থেকে এবং বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতো, সাবাস...।

বনহুরের বুক আনন্দে ভরে উঠতো, হিংস্র জন্তুর নখের আঁচড়ে যে ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতো হাতের পিঠে রক্ত মুছে হেসে বলতো-বাবুজী...তখনি ব্যাঘ্র অথবা সিংহ গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতো।

কালু খাঁ হাসতো। বনহুরের মধ্যে কালু খাঁ এমন একটা গুণাগুণ লক্ষ্য করেছিলো যা তাকে অভিভূত করেছিলো আর সেই কারণেই কালু খ বনহুরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেখে শিক্ষা লাভে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করেছে। শিক্ষকগণও তার আচরণে ছিলো সন্তুষ্ট গর্বিত এবং উৎসাহী।

কিন্তু জাভেদ দুর্জয় সাহসী কিন্তু কোন লেখাপড়া না জানায় সে হয়ে উঠেছিলো। ভয়ংকর। জীবজন্তুকে সে ভয় করতোইনা এমনকি পুলিশকেও সে কেয়ার করতো না। কতবার জাভেদ পুলিশের হাতে আটকা পড়েছে, নিহত করেছে অনেক পুলিশ তবু তাকে পুলিশ মহল আটক করে রাখতে পারেনি। পুলিশ মহলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সুযোগ বুঝে সে পালিয়ে গেছে।

পুলিশ মহল তাকে ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করেছে, ফাঁদ পেতে ধরার চেষ্টা করেছে কিন্তু সফলকাম হয়নি তারা। গাছের শিকড় ধরে ঝুলে এ গাছ থেকে ওগাছে পালিয়ে গেছে। কিছুতেই আয়ত্বে আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হীম সীম খেয়ে চুপ হয়ে গেছে।

আজও সেই জাভেদকে বন্দী করার জন্য রাজাসিংহের প্রহরীগণ ঘিরে ফেললো রংমহল। কিন্তু কোন বাধাই তাকে আটক করতে পারলো না। জাভেদ রংমহলের পিছনের অপর এক দরজা ভেঙে বেরিয়ে পড়লো এবং প্রাচীর টপকে তার নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

তারপর জাভেদকে কে পায়। প্রহরীদের অনেকেই রাইফেল থেকে গুলি ছুড়লো-জাভেদকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু তাদের গুলি ছোঁড়া ব্যর্থ হলো। জাভেদ মুহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

প্রহরীগণ তাড়াতাড়ি প্রভুর সন্ধান করতে লাগলো কিন্তু কোথাও রাজাসিংহকে তারা খুঁজে পেলোনা। অগত্যা তারা পুলিশের স্মরণাপন্ন হলো। রাজাসিংহের স্ত্রী মায়াময়ী স্বয়ং এলো রংমহলে। এ রংমহলে এই তার প্রথম পদক্ষেপ।

মায়াময়ীর মনে অনেক কথা অনেক ব্যথা। এই বাগান বাড়ি তার কাছে নরক সমতুল্য। কারণ সে জানত, তার স্বামী এই বাগান বাড়ির রংমহলে রাত্রি যাপন করে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ায়, এবং সে টাকা নানা অসৎ উপায়ে উপার্জন করে। মায়াময়ী কোন সময় স্বামীর কাছে তেমন আদর যত্ন পায়নি, পেয়েছে ব্যথা বেদনা আর অত্যাচার। তবু স্বামীর হঠাৎ নিখোঁজ সংবাদে হস্ত দন্ত হয়ে বাগান বাড়িতে চলে আসে। স্বামীকে না দেখতে পেয়ে বিচলিত হয় এবং পুলিশে সংবাদ জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে।

পুলিশ কর্মকর্তা আসেন এবং তদন্ত করে দেখেন তারপর ডায়রী করেন। কে বা কারা রাজাসিংহকে তার রংমহল থেকে অপহরণ করেছে।

রাজাসিংহের প্রধান সহকর্মী রনজিৎ বর্মা তাদের প্রহরীগণকে সাবধানে বারণ করে দেয়, তারা যেন রংমহলের সব রহস্য পুলিশ প্রধানকে না জানায়।

প্রহরীগণ রনজিৎ বর্মার নির্দেশ মত সব কথা চেপে যায়। শুধু বলে তারা, রংমহলে রাজাসিংহ বিশ্রাম করছিলেন ঐ সময় কে বা কারা প্রবেশ করে তাকে অপহরণ করেছে।

এখানে যখন ধনকুবেরু রাজাসিংহের অদৃশ্য ব্যাপার নিয়ে ভীষণ আলোড়ন শুরু হয়েছে-তখন রাজাসিংহ বনহুরের দরবার কক্ষের বন্দীশালায় আবদ্ধ।

*

জমকালো পোশাক পরিহিত বনহুর এসে বসলো তার দরবার কক্ষে। দরবার কক্ষের পাথুরে দেয়ালে মশালগুলো দপদপ করে জ্বলছে। বনহুর আসনে উপবেশন করেই বললো–নিয়ে এসো রাজাসিংহকে।

দু'জন অনুচর চলে গেলো দুটি মশাল হস্তে।

অন্ধকার কারাকক্ষে মশালের উজ্জ্বল আলো পড়তেই রাজা সিংহ ভুতল শয্যা থেকে দড়ফড় করে উঠে বসলো। ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলো; মুক্তি যেন পায় সে। যে তাকে আটক করে এনেছে সে বনহুর। দস্যু বনহুর যতই ভয়ংকর হোকনা কেন তাকে সে কমই কেয়ার করতো। কারণ তার ছিলো অগণিত অর্থ যে অর্থের প্রাচুর্যের গর্বে সে সবাইকে মানুষ বলে গণ্যই করতো না। রাজাসিংহ মনে করতো তার প্রহরীগণ সবাই শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর। বনহুর কোন দিনই তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। পুলিশ মহলকে রাজাসিংহ অর্থের বিনিময়ে কেনা গোলাম করে রেখেছিলো অবশ্য পুলিশ কর্মকর্তাগণ এতোটা জানতেন না। এ জন্য সামান্য একটু দ্বিধ ভাব ছিলো রাজসিংহের মনে, কিন্তু তা সে মনের গহণে পুষলেও প্রকাশ করেনি কোন দিন।

অর্থের প্রাচুর্যে এতোই নরপশু বনে গিয়েছিলো যে গোপনে হিরোইন ব্যবসাতেও তার শেয়ার ছিলো পুরোপুরি। শুধু হিরোইন নয় বহু অন্যায় অসৎ ব্যবসা তার ছিলো কিন্তু মুখে ছিলো সাধুতা ভরা বুলি। মাটির বিছানা ত্যাগ করে উঠে বসলো রাজাসিংহ।

বনহুরের অনুচরদ্বয় এর একজন বললো–চল রাজা।

রাজাসিংহের সেই আত্ম অহঙ্কার ভরা কণ্ঠ ঠিকই আছে, বললো–কোথায় যাবো?

দরবার গুহায়। বললো দ্বিতীয় অনুচর।

রাজাসিংহ অবাক হওয়ার ভান করে বললো–দরবার গুহা সে আবার কেমন? গুহায়তো শেয়াল-কুকুর বাস করে?

হাঁ, তবে এ গুহায় বাস করে হিংস্র সিংহ। তুমিও সিংহ্র তাই মোলাকাৎ হবে তোমাদের দুজনার।

শোন, তোমরা এখানে যা পাও আমি তার দশগুণ দেবো। কথাটা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো রাজাসিংহ।

একজন অনুচর বললো–থামলে কেনো বলো?

রাজাসিংহ গলাটা নরম করে বললো–তোমরা আমাকে মুক্ত করে দাও। প্রচুর অর্থ পাবে…যত টাকা চাও পাবে তোমরা। তোমাদের প্রভু জানতেও পারবেনা। বলবে রাজা সিংহ বন্দী শালা থেকে পালিয়ে গেছে। যা চাও পাবে।

একজন বললো–চলো, কথা বলোনা। এখানে যা কথা হচ্ছে সবই সর্দার তার দরবারে বসে শুনতে পাচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছে ..কথা বাড়িয়ে কোন ফল হবে না বরং তুমি প্রস্তাব দিলে তার জবাব পাবে আমাদের সর্দারের কাছে…

রাজাসিংহ যেন বেকুব বনে গেলো। কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল। পা বাড়ালো অনুচরদ্বয়ের সঙ্গে।

দরবার গুহায় প্রবেশ করে হতভম্ব হলো রাজাসিংহ। সে বহু জায়গা দেখেছে কিন্তু এমন স্থান সে কখনও দেখেনি। যেমন বিস্ময় তেমনি ভীতি জাগলো তার মনে। এমন অবস্থায় পড়েনি সে কোনদিন। সম্মুখে তাকিয়ে শিউরে উঠলো রাজাসিংহ। এই লোকটিকে কাল সে দেখেছে আজও দেখছে, চোখ দুটো আগুনের গোলকের মত জ্বলছে। ক্রুদ্ধ ব্যাঘের মত গর্জে উঠলো বনহুর–রাজাসিংহ, হাঁ তুমি মুক্তি পাবে। তোমাকে হত্যা করবো না, তোমার পাপের প্রায়চিত্ত এতো সহজে হবে না…না কোন অর্থ আমরা চাইনা। অর্থ বা তোমার পাপাময় ঐশ্বর্য আমাদের কাজে লাগবেনা। তবে হাঁ, তোমার অর্থ-ঐশ্বর্য তোমার দ্বারাই বিলিয়ে দেওয়াবোতোমরাই গরিব প্রতিবেশীদের মধ্যে। রহমান, সমস্ত জীবনে যে পাপ রাজাসিংহ করেছে তার উপযুক্ত পুরস্কার দাও। যাও নিয়ে যাও আমি আসছি।

বনহুরের কথামত দু’জন অনুচর রাজাসিংহকে টেনে হেচড়ে নিয়ে চলে গেলো। রাজাসিংহ করজোরে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলো। বললো–আমাকে তোমরা হত্যা করোনা। আমি প্রাণ ভিক্ষা চাইছি তার বিনিময়ে যা চাও তাই পাবে।

বনহুর বললো–প্রাণে মারলে কাল রাতেই তোমাকে তোমার বাগান বাড়ির রংমহলেই শেষ করে আসতাম। প্রাণে মারবো না, যাও…

একটু দেরী হলো না, নিয়ে গেলো অনুচরদ্বয় রাজাসিংহকে এবং সেই গুহায় নিয়ে গেলো যেখানে রাজাসিংহের দেহে অস্ত্রোপচার করা হবে। রাজাসিংহ দেখলো চারদিকে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে সে আরও দেখলো গুহাটির মাঝামাঝি একটি টেবিল, তার পাশে একটি ছোট্ট আকারে টেবিল, তার উপরে ধারালো চাকু-ছুরি এবং লৌহ শলাকা থরে থরে সাজানো। কতকটা অপারেশন থিয়েটারের মত। দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে লম্বাকৃত টেবিলটার পাশে।

রাজাসিংহের মুখ খানা বিবর্ণ আকার ধারণ করলো। আন্দাজে বুঝে নিলো সাংঘাতিক কিছু করবে তারা। অনুনয়ের সুরে সে বললো–এখানে কি করবে তোমরা?

যা করবো তা অতি মধুর, কারণ এতোদিন যে পাপকার্য করে নিজকে প্রতিষ্ঠা করেছে তারই পুরস্কার। প্রথমে তোমার হাত দু'খানা তোমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে যাতে তুমি আর কোনদিন ঐ দুটি হাত দিয়ে কারো সর্বনাশ করতে না পারো। তারপর যে চক্ষুদ্বয় তোমাকে পাপ কাজ করায় উদ্বুদ্ধ করেছে সেই চক্ষুদ্বয়কে উপড়ে ফেলবো। কথাগুলো বললো যে অনুচর অপারেশন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিলো তাদেরই একজন।

রাজাসিংহ থর থর করে কাঁপছে, বলির পাঠার মত। মুখে তার কোন কথা নাই। হা হয়ে গেছে প্রত্যাপশালী রাজাসিংহ। চোখে সে শর্ষেফুল দেখছে।

এবার বনহুরের অনুচরগণ রাজাসিংহের পা ও হাত দু'খানা বেঁধে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে দিলো। দেহের সঙ্গে টেবিলের আটকানো বেল্ট বেঁধে দিলো শক্ত করে।

অবশ্য রাজাসিংহ তাদের বাধা দিলো ভীষণ ভাবে। কিন্তু রাজাসিংহের প্রচন্ড ধস্তাধস্তি কোন কাজে এলোনা। শেষ পর্যন্ত রাজাসিংহের হাতের কুনুই থেকে দু'খানা হাত তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো। তারপর চক্ষুদ্বয় তুলে নেওয়া হলো। প্রচুর রক্তপাতে মৃত্যু না ঘটে এ জন্য ইনজেকশান দেওয়া হলো।

রাজাসিংহের অবস্থা শোচনীয়। হাত নেই, চক্ষু নেই, তার অবস্থা কেমন।

কাজ শেষ হলেই বনহুর এসে উপস্থিত হলো সেই স্থানে।

রাজাসিংহের এখন কোন দৃষ্টি শক্তি নাই। শুধু তার কানে বনহুরের ভারী বুটের শব্দ ভেসে এলো। কানে পৌঁছলো বনহুরের কণ্ঠস্বর।

কাজ সমাধা হয়েছে?

হাঁ, সর্দার।

বনহুরের কণ্ঠস্বর-জাসিংহ প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলে, তাই তোমাকে হত্যা না করে জীবনে বাঁচিয়ে রাখলাম। তোমার কর্মের উপযুক্ত পুরস্কার পেলে। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–রহমান ওকে ওর বাগান বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো।

আচ্ছা সর্দার-আপনার কথা মত কাজ হবে। বললো রহমান।

এবার যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে বললো রাজাসিংহ-এর চেয়ে আমাকে হত্যা করো তোমরা…আমি জীবন ভিক্ষা চাইনা…আমাকে হত্যা করো……

বনহুর বললো–তুমি এখন বুঝতে পারছো পাপ কর্মের পুরস্কার কত মধুর।

কথাটা বলে বনহুর বেরিয়ে গেলো।

ফুরাকে ফিরে পেয়ে আস্তানার সবাই আনন্দে ভরপুর।

নূরী তো ফুল্লরাকে বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো। ফুল্লরা আস্তানার সবার প্রিয়। যেমন জাভেদ তেমনি ফুল্লরা। নূরীর সন্তান জাভেদ আর রহমানের স্ত্রী নাসরিনের কন্যা ফুল্লরা।

ফুল্লরা নূরীর মত উজ্জল চঞ্চল যেমন ছিলো নূরী।

বনে জঙ্গলে চঞ্চল হরিণীর মত নূরী ঘুরে বেড়াতো, ঝরনার জলে সাঁতার কাটতে কখনও বা একা কখনও বনহুর সহ। তেমনি ফুল্লরা কখনও ঝরণায় কখনও একা কখনও জাভেদ সহ। বনে বনে ঘুরে ঘুরে বন্যফুল তুলে এনে মালা

গাঁথে নূরী যেমন। পরিয়ে দিতে বনহুরের গলায় তেমনি ফুল্লরা পরিয়ে দেয় জাভেদের গলায়।

বনহুর ও নূরীর মধ্য ছিলো প্রীতির সম্পর্ক, নূরী ছিলো তার বন্ধুর মত। জাভেদ ছিলো ভিন্নরূপ, সে প্রেম ভালবাসার ধার ধারতো না তবে উপলব্ধি করতো। যেমন ফুল্লরাকে রাজাসিংহ ধরে নিয়ে গেছে কথাটা শোনামাত্র তার শরীরের রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছিলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে অশ্ব নিয়ে ছুটেছিলো কান্দাই শহর অতিক্রম করে শহর তলিতে রাজাসিংহের বাগান বাড়িতে।

সে চিনতো বলেই বাগান বাড়িতে পৌঁছতে তার অসুবিধা হয়নি। জাভেদের অশ্বের খুরের শব্দ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে কান্দাই বাসীদের মনে একটি উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিলো তবে সবাই মাত্র কিছুক্ষণের জন্য কান পেতে শুনেছিলো। অনেকের মনেই দস্যু বনহুরের কথা স্মরণ হয়েছিলো। আর সে কারণেই সজাগ হয়ে শয্যায় উঠে বসেছিলো। তারপর আবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

জাভেদ রাজাসিংহের বাগান বাড়ির প্রাচীর টপকে বেরিয়ে এসেছিলো প্রহরীদের বেষ্টনী ভেদ করে।

ফিরে এসে ফুল্লরাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে অধির হয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলো সে তাকে। অবশ্য জাভেদ তার বাপুর মতই কথা কম বলতা, মুখে কিছু না বলে চুমু দিয়েছিলো ফুল্লরার ললাটে।

মনে খুশির উচ্ছ্বাস বয়ে চলে। জাভেদ কোনদিন তাকে এ ভাবে স্পর্শ করেনি। বরং তার সান্নিধ্য কমই লাভ করতে তার এই বয়সে। জাভেদকে ভাল বাসতে ফুল্লরা কিন্তু জাভেদের দিক থেকে ফুল্লরা কোনদিন কোন সাড়া পায়নি বরং পেয়েছে অবহেলা আর তাচ্ছিল্যতা।

ব্যথা পেয়ে অভিমান করে সেও সরে গেছে, কথা বলেনি কোন। আজ জাভেদের পরিবর্তন লক্ষ্য করে ফুল্লরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠে। সেও গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে জাভেদের গলা।

জাভেদ সব সময় বনজঙ্গলে বন্য পশুর সঙ্গে খেলা করেই সে কাটিয়েছে, সেই স্বভাব তার যায়নি। এখনও জাভেদ গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, সুমিষ্ট ফল পেড়ে খায় আবার কিছু নিয়ে আসে ফুল্লরার জন্য।

ফুল্লরা খেতে না চাইলে জোর করে খাইয়ে দেয় জাভেদ ওকে।

ফুল্লরার মুখে দুষ্টোমির হাসি ফুটে উঠে।

*

পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশে পুলিশ মহল সমস্ত শহরে তল্লাশী চালিয়ে চললো। হোটেল ক্লাব এমন কি আত্নীয় স্বজনের বাড়ি সমস্ত জায়গায় সন্ধান করেও পাওয়া গেলো না রাজাসিংহকে। সবাই হতাশ হয়ে পড়লো।

সেই দিন গভীর রাতে বাগান বাড়ির মধ্যে গোঙ্গানী শুনে বাগান বাড়ির মালি ছুটে এসে সংবাদ দিলো, রাণীমা-রাণীমা বাগান বাড়ির রংমহলের মধ্যে কেউ গোঙ্গাচ্ছে...আমি অনেক ডাকলাম কিন্তু কাউকে আশে পাশে পেলাম না। প্রহরীরা রাজা বাবু নেই বলে সবাই যার যার বাড়ি গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

রাণী মা হাজার হলেও তার স্বামী নিখোঁজ হওয়ায় ভীষণ চিন্তিত। রাতে ঘুম নেই তার চোখে। বাগান বাড়ির মালির মুখে রংমহলের ভিতরে গোঙ্গানীর শব্দ শুনতে পেরেছে জেনে স্থির থাকতে পারলোনা, তক্ষুণি রাজাসিংহের প্রধান সহকারী রনজিৎ বর্মাকে নিয়ে হাজির হলো বাগান বাড়িতে। রংমহলের দরজায় এসেই শুনতে পেলো মনুষ্য কণ্ঠের গোঙ্গানীর আওয়াজ।

রনজিৎ প্রহরীদের ডাকা হাকা শুর করলো।

কিন্তু কারো সাড়া শব্দ নাই।

ফটকের প্রহরীও আর একজন চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দাঁড়ালো। রনজিৎ বর্মাকে ও রাণী মাতাকে দেখে ভীষণ ভড়কে গেলো। এমনকি বাগানের মালিও আছে। তাদের সঙ্গে।

রাজসিংহের চেয়েও সবাই রনজিৎ বর্মাকে বেশি ভয় করতো। তাই করজোরে বললো গেটের প্রহরী–হুজুর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রনজিৎ বর্মা বললো–তোমাদের মালিক এখন আমি। আমি ও তোদের রাণী মা বাগান বাড়িতে এলাম অথচ তোরা সবাই ঘুমাচ্ছিস দেখাবো মজাটা...।

রানী মা ক্রুদ্ধ এবং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো–ও সব কথা এখন রাখুন। চলুন রংমহলের ভিতরে জানিনা কি বা কে আছে সেখানে চলুন...সে পা বাড়ালো রংমহলের অভ্যন্তরে।

রংমহলের ভিতরে প্রবেশ করে আরও স্পষ্ট শুনতে পেলো গোঙ্গানীর শব্দ, তার সঙ্গে আর্তকণ্ঠস্বর বাঁচাও, তোমরা কে-এসেছো আমাকে বাঁচাও...।

রনজিৎ বর্মা সুইচ টিপে আলো জ্বালো, সঙ্গে সঙ্গে রংমহলের সব আলো জ্বলে উঠলো। জমাট অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখলে হেলান দিয়ে একটা সোফায় বসে আছে রাজাসিংহ। শিউরে উঠলো মায়াবতী রাণী মাতা ও রনজিৎ বর্মা। দুহাতে চোখ ঢাকলো রাণী মাতা।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে হস্তদ্বয়হীন এবং চক্ষুদ্বয় অন্ধ রাজাসিংহ। সেই অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙ্গাচ্ছিলো এতোক্ষণ।

রনজিৎ বিস্ময় নিয়ে বললো–একি অবস্থা আপনার? কে বা কারা আপনার এ অবস্থা করেছে।

রাণীমাথাও ধীরে ধীরে চোখের কাপড় সরিয়ে তাকালো স্বামীর দিকে, কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো–কে তোমার এমন করলো, ওগো-কে তোমার হাত দু'খানা কেটে নিয়েছে? কে তোমার চোখ উপড়ে তুলে নিয়েছে, বলো ওগো-বলো...।

সব বলবো আমাকে আগে বাড়ি নিয়ে চলো। বিকৃতগলায় বললো রাজাসিংহ। এই রংমহল তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় স্থান। স্বর্গের চেয়েও সুখময় আর আজ এ রংমহল তার কাছে নরকের চেয়েও অভিশপ্ত লাগছে। রাজাসিংহ পারছেনা কিছু ধরতে পারছেনা কিছু দেখতে। সব অন্ধকার, সব অন্ধকার।

চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো রাজাসিংহ, তাকে এ মুহূর্তে একটি পঙ্গু ভিখারীর চেয়েও অসহায় মনে হচ্ছিলো।

রনজিৎ বর্মা পুলিশ অফিসে ফোন করলো এবং রাজাসিংহকে বাড়ি নিয়ে এলো। রাণীমাতার কোলে মাথরেখে গাড়ির পিছন আসনে শুয়ে আর্তনাদ করতে লাগলো রাজাসিংহ।

বাড়ি পৌঁছে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো রাজাসিংহকে।

রাত ভোর হয়ে এলো।

পাখি কলরবে মুখর হলো পৃথিবী।

পুলিশ কর্মকর্তা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সহ কর্মীদের নিয়ে।

রাজাসিংহের চরম অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন পুলিশ কর্মকর্তা এবং তার সহকারীগণ।

রাণীমাতা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে চলেছেন।

ডাক্তারও এলেন।

ডাক্তারকেও ফোন করা হয়েছিলো।

পুলিশ সুপার ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো–আপনি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা আমাদের উচিৎ হবেনা। ডাক্তার বাবু আপনাকে কিছু সুস্থ করে তুলুন তারপর……

রাজাসিংহ ফোঁকিয়ে ফোঁকিয়ে বললো–আমি অন্ধ কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। চিরদিনের জন্য আমাকে ওরা দৃষ্টিহীন করে দিয়েছে। এ পৃথিবীর আলো চিরতরে মুছে গেছে, সব অন্ধকার-সব অন্ধকার।

ডাক্তার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন রাজাসিংহের দিকে। তিনি বহু রোগী দেখেছেন কিন্তু এমন বিস্ময়কর রোগী দেখেননি।

ডাক্তার ভালভাবে পরীক্ষা করলেন রাজাসিংহকে। তিনি পরীক্ষা শেষ করে বললেন-অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রপচার করা হয়েছে। হাত এবং চক্ষুদ্বয় সূক্ষভাবে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ব্যান্ডেজ বাধা এবং ঔষধ পত্র ঠিক ভাবে লাগানো হয়েছে, রোগীর মৃত্যুর কোন ভয় নেই। তারপর পুলিশ কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে বললেন-আপনারা ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আমি নিজেও ওনার কথা শুনতে আগ্রহী।

পুলিশ কর্মকর্তা চেয়ারটা টেনে নিয়ে রাজাসিংহের কাছাকাছি বসলেন। পুলিশ সহকারীকে ডায়রী লিখে নেবার জন্য বললেন।

কাগজ কলম নিয়ে বসলেন পুলিশ অফিসারটি।

রাজাসিংহ কেঁদে উঠলেন।

পুলিশ কর্মকর্তা বললেন-কাঁদবেন না এতে চোখের অসুবিধা হবে। বলুন কি করে আপনার এ অবস্থা হলো?

রনজিৎ বর্মা এবং আরও আত্নীয়-স্বজন ঘিরে ধরে দেখছিলো। রনজিৎ বর্মা ছাড়া সবাইকে পুলিশ কর্মকর্তা কক্ষ ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। সবাই বেরিয়ে গেলো, শুধু কক্ষ মধ্যে রইলো রনজিৎ বর্মা আর রাণীমাতা।

রাজাসিংহ বলতে লাগলো-রংমহলে বসে বিশ্রাম করছিলাম। এমন জন দস্যু এসে আমার কাছে প্রচুর অর্থের দাবি করে। আমি তাদের দাবি না স্বীকার করায় আমার হাত, মুখ বেঁধে আমাকে তারা নিয়ে যায়, তারপর আমার এ অবস্থা…বলে কাঁদতে শুরু করে রাজাসিংহ।

পুলিশ প্রধান বললেন-কোন পথে, কোথায়, কতদূর আপনাকে তারা নিয়ে গিয়েছিলো বলতে পারেন।

পারবো, তবে রাতের অন্ধকারে খুব বেশি স্মরণ করতে পারছি না। আমার মনে হয় গভীর জঙ্গলে আমাকে অশ্ব যোগে নিয়ে গিয়েছিলো তারা। তারপর সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কোন ভূগর্ভ স্থানে একটি অন্ধকার গুহায় আটক করে রাখে…

তারপর? বললেন পুলিশ প্রধান।

তার সহকারী ডায়রী লিখছিলেন।

বলতে লাগলো রাজাসিংহ-তারপর আমাকে এমন এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো, তেমন স্থান আমি কখনও দেখিনি। বিরাট একটি গুহা, গুহার চার দেয়ালে দপ দপ করে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে দেখলাম গুহার মধ্যে একটি পাথরের আসনে উপবিষ্ট জমকালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি। মুখমন্ডল উন্মুক্ত ছিলো, দেখলাম, লোকটা সুন্দর সুপুরুষ আর তার চোখ দুটো যেন অগ্নি গোলক। তারই নির্দেশে আমার এ অবস্থা…

পুলিশ সুপার অস্ফুট কণ্ঠে বললেন-নিশ্চয়ই এটা দস্যু বনহুরের কাজ। রাজসিংহের বর্ণনা থেকেই সব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ নয় স্বয়ং দস্যু বনহুর।

কক্ষ মধ্যে সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

সবার মুখেই ফুটে উঠলো একটা ভীতি ভাব।

ডায়রী লিখে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন পুলিশ সুপার। তার ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তা রেখা। তিনি যখন গাড়িতে চাপতে যাচ্ছেন সেই মুহূর্তে একটি ছোট বালক একটি কাগজের টুকরা পুলিশ সুপারের হাতে দিয়ে বললো–এই কাগজটা আপনার।

পুলিশ সুপার কাগজখানা হাতে নিয়ে মেলে ধরলেন, কাগজে লিখা আছে রাজাসিংহ যে পাপ করেছে তার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছি–দস্যু বনহুর

বিস্ময়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন-বনহুর। রাজাসিংহকে তার কর্মের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছে। হাঁ, যা হয়তো আইনের বিচারে সম্ভব ছিলো না, তাই করেছে সে।

কাগজখানা পকেটে ভাজ করে রেখে গাড়িতে চেপে বসলেন পুলিশ সুপার। ললাটে তার গভীর চিন্তা রেখা ফুটে উঠলো, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কথা, অনেক কাহিনী তিনি শুনে এসেছেন। আইনে হয়তো তাকে সবাই দোষী বলে মনে করে। কিন্তু আসলে আইন যা পারেনা বা বিচারে যা অন্যায় মনে হয় তাই সমাধান করে বনহুর।

পুলিশ সুপার রাজাসিংহের অনেক কথা শুনেছেন, এমন কি রাজাসিংহ হিরোইন ব্যবসা করে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করেছে এং ঐশ্বর্যের ইমারৎ গড়েছে, এটা সবাই না জানলেও পুলিশ মহল জানে কিন্তু পুলিশ মহলও ঐশ্বর্য আর অর্থবানদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না অনেক সময়। কাজেই বনহুর তার সমাধান অতি সহজেই করে থাকে। পুলিশ প্রধানের মাথা নত হয় বনহুরের উদ্দেশ্যে।

*

রাজাসিংহ কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিন্তু সে এখন বড় অসহায়।

জীবনে বেঁচে আছে বটে, তবে সে এখন ছোট শিশুর চেয়েও অধম। কোন কিছু দেখবার সৌভাগ্য তার নাই। হাত নেই যে স্পর্শ করে অনুভব করবে? এখন সে মনে করে এর চেয়ে তার মৃত্যু ভাল ছিলো। আর সে বাগান বাড়ির রংমহলে যেতে পারেনা। রংমহলের সেই স্বর্গস্বাদ আর তাকে অভিভূত করতে পারেনা। এমনকি তার সব ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলো। আর কোন সহকারী বন্ধু বান্ধব আসেনা তার ব্যবসার আলোচনা নিয়ে। যারা আসে তারা শুধু যে যার পাওনা টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য। চাকর বাকর প্রহরীগণ কেউ আর তার কথা গ্রাহ্য করে না। সবাই যে যার ইচ্ছা। মত কাজ করে।

অসহায় অন্ধ রাজাসিংহের আজ করুণ অবস্থা।

সুযোগ বুঝে রনজিৎ বর্মা টাকা-কড়ি ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র রাজা হয়ে বসলো। ক্রমান্বয়ে সরিয়ে ফেলতে লাগলো রাজাসিংহের সমস্ত সম্পদ।

এখন রংমহলে বসে রনজিৎ বর্মা।

বাঈজী নাচ শুরু হলো।

সব ঘরে বসে শুনতো রানী মাতা। দু'চোখ ভেসে যেতে অশ্রুতে, কারণ ঐ রংমহল তার সর্বনাশ করেছে। স্বামী অন্ধ, হাত বিহীন অকেজো। রনজিৎ আজ সব হরণ করে নিয়েছে, রনজিতের দয়ায় তাদের ভরণ পোষণ চলছে। কেউ কোন কর্মচারী কোন রকম যোগাযোগ করেনা। মায়াবতি চোখে অন্ধকার দেখছেন।

রনজিৎ বর্মা সেদিন রাজাসিংহের নিকটে এসে বসলো; বললো সে-সব ব্যবসা তো বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার অবর্তমানে লোন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এমন কি বাড়িটাও নিলামে উঠেছে। আমি চাই অপমানিত করে বের করে দেওয়ার পূর্বেই আপনারা অন্যত্র কোন ছোট খাটো বাড়িতে চলে যান। নইলে হঠাৎ কোন বাড়ি যোগার করা সম্ভব হবেনা হয়তো।

এ তুমি কি বলছো রনজিৎ বর্মা। বাড়িখানাও নিলামে উঠেছে। রাজাসিংহের : বুকচিরে কথাটা বের হলো।

রানীমা তার মুখে কোন কথা নেই। চোখে তিনি অন্ধকার দেখছেন। একি সর্বনাশ, বাড়ি খানাও চলে যাবার পথে। করজোরে বললো রানীমাতা, রনজিৎ বাবু আপনি আমাদের এক মাত্র আপনজন। বাড়িখানা রক্ষা করুন। এ বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবো এই পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে।

তা আমি কেমন করে বলবো। তবে পাশের ঘরে আসুন কথা আছে আপনার সঙ্গে। বললো রনজিৎ বর্মা।

সরল মনা রানী মাতা বললো–কি এমন কথা বলুন।

না, পাশের ঘরে চলুন। রানী মাতার হাত ধরে বললো রনজিৎ বর্মা চলুন।

পাশের ঘরে এসে বললো রানীমাতা-বলুন কি এমন কথা?

আপনার কি এমন বয়স হয়েছে, পঙ্গু স্বামী নিয়ে আর কত কাল কাটাবেন। আপনাকে পেলে আমি আপনার বিনিময়ে এ বাড়ি......

ছিঃ এ আপনি কি বলছেন।

হাঁ, ঠিকই বলছি। আপনার বয়স বা কতই হয়েছে। এ বয়সে বিদেশী মেয়েদের বিয়েই হয়না, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর এমনকি...সব ফিরে পাবেন। যা চাইবেন তাই পাবেন।

না, আমি ভেবে পাচ্ছিনা এমন কুৎসিত উক্তি কি করে উচ্চারণ করছেন।

অন্ধ পঙ্গু স্বামী আপনার কিছু করতে পারেনা কথাটা বলেই রানীমাতার দু'হাত ধরে টেনে নিলো কাছে।

রাণীমাতার অপরূপ সৌন্দর্য রনজিৎ বর্মাকে লোভাতুর করে তুলেছিলো। আজ সব সীমা তার ছাড়িয়ে গেলো।

রানীমাতাকে রনজিৎ বর্মা যখন আকর্ষণ করলো। তখন রাণীমাতা চিৎকার করে উঠলো-ওগো আমার সর্বনাশ করোনা-বাচাও আমাকে-বাচাও।

শয্যা ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি এগুতে গিয়ে ভূতলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো রাজাসিংহ। চারিদিকে শুধু জমাট অন্ধকার।

ঠিক সেই মুহূর্তে জানালার শার্শী ভেঙে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলো জমকালো মূর্তি এবং রনজিতের বুকে বসিয়ে দিলো সূতীক্ষ্ণ ধার ছুরি। ছুরিটা তুলে নিয়ে বললো–আপনি স্বামীর কাছে ফিরে যান। কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ বাড়ি আপনার…..

[পরবর্তী বই স্বর্ণ সিংহাসন]

পূর্ববর্তী:

« ৮.১৬ হীরা ঝিলের গহ্বরে

পরবর্তী:

৮.১৮ স্বর্ণ সিংহাসন »